গল্প - অভীক সরকার

Posted in **গল্প**



গল্প

ভোগ
অভীক সরকার

মূর্তিটাকে দোকানে দেখেই ভারি পছন্দ হয়ে গেলো অতীনের। কিন্তু তারপর মূর্তিটাকে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে...

পার্ক স্ট্রিটের এই কিউরিওর দোকানে প্রায়ই আসে অতীন। মালিক সুবেশ আগরওয়ালের সঙ্গে গল্পগুজব করে কিছুক্ষণ, এটা ওটা নেড়েচেড়ে দেখে, কিছু পছন্দ হলে ঘরে নিয়ে যায়। সুবেশের সঙ্গে মাত্র এই কয়েকবছরেই বেশ একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেছে অতীনের। দুজনেই ব্যাচেলার, বয়েসও কাছাকাছি, একত্রিশ আর তেত্রিশ। তার ওপর সুবেশ আগরওয়াল নামেই মাড়োয়াড়ি, পাঁচ পুরুষের বাস কলকাতা শহরে। চট করে দেখলে বা কথা বললে মনে হয় মাণিকতলার গলি থেকে বগলে ব্যাগ নিয়ে বার হয়ে পান চিবোতে চিবোতে গিল্যাণ্ডার হাউসে কেরানিগিরি করতে যাওয়া বাঙালি বাবুটি বুঝি।

অতীনের সঙ্গে সুবেশের এই হৃদ্যতা দোকানদার আর খদ্দেরের সাধারণ আলাপচারিতার থেকে অনেক বেশি। ধার বাকি তো আছেই, সময় সুযোগ বুঝে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ড্যান্স বারে বসে মদ্যপান, শনিবার দেখে মাঝেমধ্যে রেস কোর্সে ঢুঁ মারা, সবই চলে। সুবেশের আরও দুটি সদগুণ হচ্ছে - এক, টাকার জন্যে অতীনকে মোটেও তাগাদা দেয় না, আর দুই, চারপেগের পর লোকটা ভারি উদার হয়ে পড়ে, কিছুতেই অতীনকে পয়সা দিতে হয় না।

আজ অক্টোবরের শেষ শনিবার। অফিস ফেরতা আজও এসেছিল অতীন, টুকটাক গল্প করে তারপর মেট্রো ধরে নেতাজিনগরের বাসায় ফিরে যাবে, এই ছিল প্ল্যান। এমনিতেও অতীন অকৃতদার, তার ওপর প্রথম যৌবনেই মা বাবা দেহ রাখেন, তার বাড়ি যাবার তেমন তাড়া থাকে না। বুড়ি কাজের লোক পুষ্পদি ছাড়া অতীনের তিনকূলে কেউ নেইও। পুষ্পরাণী এবাড়িতে সর্বক্ষণের কাজের লোক হয়ে আসেন যখন অতীন জন্মায়। সেই থেকে রয়ে গেছেন ভদ্রমহিলা, সার্বজনীন পুষ্পদি হয়ে। এই বুড়ি ছাড়া অতীনের তিনকূলে আর কেউ নেই। ফলে যখন খুশি বাড়ি ফেরার এই স্বাধীনতাটা খুব আয়েশ করেই উপভোগ করে অতীন। বাপ মা একটা দোতলা বাড়ি আর মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স রেখেই দেহ রেখেছেন, টাকার খুব একটা টানাটানি অতীনের নেই, সে নিজেও একটা এফ এম সি জি কম্পানির ট্রেড মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ হিসেবে কাজ করে, মাইনে খারাপ নয়, তদুপরি ইন্সেন্টিভ তো আছেই।

তার স্বভাবচরিত্র ভালো, পাড়াপড়শিরা তাকে ভালোবাসেন, রাস্তায় দেখা হলে খোঁজ নেন। বার্সিলোনা, পলিটিক্স, ইস্টবেঙ্গল, সিনেমা - এসব নিয়ে অতীন সুখেই আছে।

অতীনের শখ বলতে শুধু একটিই, অ্যান্টিক কিউরিও কেনা। তার মাসিক হাতখরচের বেশিটাই চলে যায় টুকটাক পুরোনো জিনিস কিনতে। অবশ্য খুব বেশি দামি কিছু না, এই একটা টেবিলঘড়ি কি পুরোনো আফ্রিকান মুখোশ, এই আর কি। আজকাল আবার ঝুঁকেছে মূর্তি কেনার দিকে। ঘরের একটা কোণ ফাঁকা আছে। তক্কেতক্কে আছে, ভালো দাঁওতে একটা মূর্তি পেলে কিনে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখবে।

তাই মূর্তিটাকে দোকানে দেখেই ভারি পছন্দ হয়ে গেলো অতীনের। ফুট তিনেক মতন লম্বা, পিতলের তৈরি দেবীমূর্তি। সারা মুর্তিটা সবজেটে নীল রঙের। মুকুট ও অন্যান্য অলঙ্কারের ডিজাইন দেখে মনে হয় তিব্বতীয় বৌদ্ধমূর্তি। আরেকটু ভালো করে দেখবে বলে মূর্তির কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে দেখতে লাগলো অতীন।

দেবীমূর্তিই বটে। পদ্মের ওপর বসে আছেন দেবী, ডান পা নিচে নামানো, বাঁ পা ভাঁজ করে ডানপায়ের হাঁটুর ভাঁজে ঢোকানো। দেবীর চার হাত, নিচের বাঁ হাতে বীণা ধরে আছেন, ডানহাতে অভয়মুদ্রা। বৌদ্ধদের মধ্যে সরস্বতী পুজোর প্রচলন ছিল নাকি? ধন্দে পড়ে গেলো অতীন। আস্তে আস্তে চোখদুটো ওপরে তুললো অতীন, আর ওপরের হাত দুটোর দিকে নজর পড়তেই থমকে গেলো,

ওপরে ডানহাতে খড়্গ, আর বাঁ হাতে নরকরোটি!!!

আজ অবধি এমন অদ্ভুত কম্বিনেশনের মূর্তি একটিও দেখেনি অতীন। একই সঙ্গে খড়্গ, করোটি আর বীণা?

দেবীর মুখে স্তিমিত প্রসন্ন হাসি, নেশাতুর নয়ন। আর অত্যন্ত আবেদনময়ী শরীর। সারা মুর্তি জুড়ে আঁটোসাঁটো যৌনতা ফেটে পড়ছে যেন। পীনোন্নত স্তনযুগল, তার ওপর চওড়াকাপড়ের পট্টি বাঁধা আছে কাঁচুলি হিসেবে, যদিও এই মদোন্মত্ত যৌবনদুটিকে আটকে রাখা তার সাধ্য নয়। সরু কোমর, একটা কটিবন্ধনী দিয়ে আবৃত। একটি স্নিগ্ধ রম্যশ্রী সমগ্র মূর্তি জুড়ে লেগে আছে, শান্ত শৃঙ্গাররসের এমন গ্রেসফুল প্রকাশ আর দেখেনি অতীন। সে আরও মুগ্ধ হলো মূর্তিকারের হাতের কারুকাজ দেখে। নাভি থেকে স্তনযুগলের মাঝ অবধি যে লোমরাজি উঠে এসেছে, সেটিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটে উঠেছে মূর্তির মধ্যে। এমন সূক্ষ্ম হাতের কাজ অতীন শেষ কবে দেখেছে নিজেই মনে করতে পারলো না।

"বাহ, সুন্দর তো" তৃপ্ত মুখে উঠে দাঁড়ালো অতীন, মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে মূর্তিটি বিলক্ষণ পছন্দ হয়েছে তার। মোবাইল পকেটে ঢুকিয়ে গলা তোলে সে, "বাবা সুবেশ, কি রকম দাম রেখেছিস এটার? দেখিস, গলা কাটিস না কিন্তু ভাই, হ্যা হ্যা হ্যা।"

সুবেশ খিঁচিয়ে ওঠে "হ্যাঁ রে শালা, তোর গলা কেটে তো হেব্বি পয়সা পাবো কি না, চিপ্‌পুস কঁহিকা। শালা, নিবি তো একটা কাঁথা কি ভাঙা ঘড়ি, তার জন্যে আবার দরাদরি কিসের, অ্যাঁ? দ্যাখ ভাই, পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি, ভালো মাল দেখলে কিন্তু ছাড়াছাড়ি নেই, যেমন গুড় ঢালবে ......" বলতে বলতে এদিকেই এগিয়ে আসছিলো সুবেশ। হঠাৎ করে মূর্তিটার দিকে চোখ পড়তে থমকে যায়, "ওহ, ইয়ে, মানে এইটাই পছন্দ হলো নাকি তোর?"

"হ্যাঁ, আপত্তি আছে তোর?" হাসতে হাসতেই বলে অতীন, কিন্তু পরক্ষণেই সুবেশের মুখ দেখে একটু সিরিয়াস হয়ে পড়ে, "কি রে, কি হলো রে? গম্ভীর হয়ে গেলি কেনো? এনিথিং রংউইথ দ্যট স্ট্যাচু?"

সুবেশ কিছু কথা না বলে পকেট থেকে একটা গোল্ড ফ্লেক কিং সাইজ বার করে অতীনকে দেয়, নিজেও একটা বার করে, তারপর তার ফিল্টারের দিকটা অন্যমনস্কের মতন দোকানের কাউন্টারের ওপর ঠুকতে থাকে।

সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে সরু চাউনিতে সুবেশকে একবার মেপে নেয় অতীন। যথেষ্ট প্র্যাকটিক্যাল চালু জিনিস এই সুবেশ আগরওয়াল। এসব নাটক করে দাম বাড়াচ্ছে না তো?

"মূর্তিটা তুই এমনিই নিয়ে যা। আসলে ওটা আমি কিনিনি, একজন দিয়ে দিয়েছে, বুঝলি। এমনিই দিয়েছে, ফ্রি তে, একপয়সা নেয়নি। শালা কিসের, কার মূর্তি আমি নিজেও জানি না। ভাবলাম একবার প্রফেসর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যর কাছে নিয়ে যাই। তিব্বতি মূর্তিটুর্তি লাইনে উনিই অথেনটিক কি না। তারপর তো খোঁজ নিতে গিয়ে শুনি উনি অনেক দিন আগেই অফ হয়ে গেছেন। এখন ভাবছি কার কাছে যাই। ভালো করে না জেনে শালা দামও হাঁকতে.... "

"আহহ, বড্ড বাজে বকিস তুই সুবেশ", ধমক দেয় অতীন, "মালটা পেলি কি করে আগে সেইটা বল"।

"ওহ, হ্যাঁ, দাঁড়া বলছি", বলে সিগারেটটা ধরিয়ে একটা সুখটান দেয় সুবেশ, তারপর শুরু করে,

"লাস্ট উইকে, বুঝলি, বামুনগাছি গেছি। চিনিস তো? দমদম ক্যান্টনমেন্ট লাইনে। খবর ছিল এক পুরোনো জমিদারবাড়ি ভাঙা পড়ছে। পুরোনো মানে প্রায় ছ'শো বছরের পুরোনো স্ট্রাকচার। প্রতি একশো দেড়শো বছর অন্তর অন্তর রিমডেলিং আর সারাই করে জমিদার ফ্যামিলি ওখানেই আছে ছ'শো বছর ধরে। লাস্ট মেজর রিস্ট্রাকচারিং নাকি সিপাই বিদ্রোহের পরের বছর হয়, প্রায় একশো সত্তর বছর আগে। বাড়ির তখনকার মালিক নাকি নুনের আর কাটা কাপড়ের ট্রেডিং করে প্রচুর পয়সা কামায়। প্রচুর মানে প্রচুর। পরের সাত জেনারেশন বসে খেতে পারে এমন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে আর পাঁচটা বাঙালি জমিদারবাড়ির মতন এদের মধ্যে কোনও শরিকি বিবাদ দেখা দেয় নি। যার আলাদা হবার কথা, নির্বিবাদে নিজের পাওনাটা নিয়ে চুপচাপ কেটে পড়েছে। নো মামলা মোকদ্দমা, নো হ্যাঙ্গাম।

"তা প্রেজেন্ট জেনারেশনের যিনি মালিক, নারায়ণ চক্রবর্তী, তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ে থাকে ইউ এস এতে। ছেলে সফটওয়্যারে আছে, হেবি উঁচু পোস্ট আর সেই রকম মাইনে। সাউথ সিটিতে পনেরোশো স্কোয়ারফিটের ফ্ল্যাট, বুঝলি? দুই ভাইবোনে হেব্বি ভাব মাইরি, না দেখলে বিশ্বাস হয় না শালা, আমাদের ফ্যামিলিতে তো ভাবাই যায় না।

"সে যাক গে। তা এই চক্কোত্তি মশাই তো গত মাসে পটল তুলেছেন। ইউ এস থেকে মেয়ে জামাই, কলকাতা থেকে ছেলে বউ, দুই পক্ষের একগাদা বাচ্চাকাচ্চা মিলে এসে হাজির। প্রচুর খরচাপাতি করে, আশেপাশের দশ গ্রামের লোক খাইয়ে তারা চক্কোত্তি ফ্যামিলির নাম রাখলো। তারপরেই তো চিত্তির। অত বড় প্রপার্টি দেখবে কে? দুদিনে পার্টির পেটে যাওয়া তো নিশ্চিত। তা ছেলে আর জামাই দুজনেই বুদ্ধি করে বামুনগাছি আসার আগেই দালাল লাগিয়ে এসেছিলো। খাঁটি ঘি দুধ খাওয়া ব্রেন ভাই, তোর আমার মতন নাকি?

"তা শ্রাদ্ধশান্তি শেষ, দালাল তো খুবই চটপটে লোক, কেনার লোক এনে হাজির। দুদিনের মধ্যে সইসাবুদও শেষ। শোনা যায় কোটি টাকার কাছাকাছি ডিল, গ্রামের হাওয়া তাই নিয়েদেখলাম খুব গরম।

"তা এই যে দালাল, বুঝলি, আমারই জাতভাই, নাম রাজকমল গিলরা, সেই আমাকে নিয়ে যায় জমিদারবাড়িতে। তোকে তো আর বলতে হবে না, বেঙ্গলের এইসব পুরোনো জমিদারবাড়ি এক একটা অ্যান্টিক আর কিউরিওর ডিপো। পুরোন বই থেকে শুরু করে ঝাড়লন্ঠন, ওয়াল ক্লক, পেইন্টিং, সেজবাতি, এমনকি রাইটিং ডেস্ক আর থালাবাসন অবধি!

"তা আমিও দালালের দেশোয়ালি ভাই হবার সুবাদে বেশ কিছু ভালো জিনিস বেশ সস্তা দরেই পেয়ে গেলাম, বুঝলি? তারপর টাকাপয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় ওদের যে পুজো করার ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক, তিনি এসে এইটে রাখলেন আমার সামনে, বললেন "এইটে নিয়ে যান, পয়সা দিতে হবে না"।"

এতটা বলে একটু থামলো সুবেশ। অতীন বলে উঠলো, "সে কি রে, ওদের জিনিস, পুরুত মশাই এসে বিলিয়ে দিলেন? ওরা কিছু বললো না?"

ভ্রু কুঁচকে কি যেন ভাবলো সুবেশ, তারপর বললো, "যেটা বুঝলাম, এই পুজারী ব্রাহ্মণটি অনেকদিন ধরে এই জমিদারবাড়ির সঙ্গে যুক্ত। খুব সম্ভবত জেনারেশন ধরে এরা পুজো করে এসেছে। বুঝিসই

তো, এই সব জায়গায় একটা জোর এসেই যায়। জামাই বোধহয় একবার বলতে গেছিলো যে অমন অ্যান্টিক মূর্তি ফ্রিতে দিয়ে দেওয়াটা ঠিক কি না। মেয়ে তো দাবড়েই থামিয়ে দিলো, বলে জ্যেঠু যা করছে নিশ্চয়ই ভালোর জন্যেই করছেন। বুঝলাম, এই ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকটিকে ওরা খুব রেসপেক্ট দেয়।"

আবার থামলো সুবেশ। সেই সুযোগে সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অতীন বললো "তা ফোকটে পেয়েছিস ভালো কথা। এখন কথা হচ্ছে নিশ্চয়ই এটা পুজো করা হতো না, কারণ পুজো করা মুর্তি কেউ বিক্রিও করে না, কাউকে এই ভাবে দেয়ও না। দিলে মন্দিরে দেয় বা কারও বাড়িতে দেয়, যাতে পুজোটা বরকরার থাকে, তাই না? তা এই অ্যান্টিক জিনিসটা তোকে এমন ফ্রিতে বিলিয়ে দেওয়ার কারণটা জিজ্ঞেস করিস নি?"

বেশ খানিকক্ষণ ভ্রু কুঁচকে কি যেন ভাবলো সুবেশ, "একটা কথা কি মনে হলো জানিস? হয়তো বা মনের ভুলই হবে, বাকি কাজের লোকজনকে দেখলাম মূর্তিটাকে এড়িয়ে চলতে। ইন ফ্যাক্ট বাড়ির লোকজনেরও দেখলাম, মূর্তিটার প্রতি একটা ভয় বা দূরে রাখার প্রবণতা আছে। পুরুতমশাই ছাড়া কেউ ছোঁয়নি ওটা। উনি এসে রাখলেন, আমিও তুলে নিয়ে এলাম। যখন নিয়ে আসছি, ঠাকুরমশাইকে দেখলাম বিড়বিড় করে কি একটা মন্ত্র পড়তে। কি জানি, নিয়ে আসার সময় একটু অস্বস্তিই হচ্ছিলো আমার, বুঝলি?"

দু মিনিট কি একটা ভাবলো অতীন, তারপর বললো "আসলে একটু বিটকেল দেখতে তো, তাই বোধহয়... গ্রামের দিকের লোকজন সব, এমনিতেই সুপারস্টিশনের ডিপো। তুই আমাকে দে তো। আমি নিয়েই যাই। পয়সাকড়ি না হয় তুই যা বলবি সেরকম দিয়ে দেবো'খন পরে, কেমন?"

হেসে ফেললো সুবেশ, "আরে তুই নিয়ে যা তো। তোর সঙ্গে কি টাকার সম্পর্ক নাকি রে আমার? যখন যা মনে হয় দিস। তবে সাবধানে রাখিস ভাই। আমারই একটু কেমন কেমন লাগে মূর্তিটার দিকে তাকালে।"

এবার অতীনও হেসে ফেলো, "এই বয়সে তোর কি ভীমরতি ধরলো সুবেশ, দিস ইজ জাস্ট আ স্ট্যাচু, ইয়ার।"

সুবেশ একটু সিরিয়াস হয়ে যায়, "তবুও, তুই একটু নিজের পুরুতঠাকুরকে দিয়ে দেখিয়ে নিস, বুঝলি? এই, জাস্ট মনে পড়ে গেলো একটা ইম্পর্ট্যান্ট কথা। ওদের ওই পূজারী ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক কিন্তু সাধারণ অং বং চং আওড়ানো পুরুত নয়। এটা আসার সময় আমার কাজিন রাজকমল বলেছিলো, উনি কিন্তু ওদিককার একজন বিশিষ্ট ইয়ে, বুঝলি? শুধু উনি কেন,ওনার বাপ, দাদা, মানে ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন অনুযায়ী ওনারা খুব বিখ্যাত ইয়ে।"

"আহ, ইয়েটা আবার কি?" অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে অতীন।

কাছে এসে, কাউন্টারের ওপর মুখ নামিয়ে খুব গোপন খবর দেবার ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলে সুবেশ, "তান্ত্রিক, ওনারা ওদিককার খুবই বিখ্যাত তান্ত্রিক, বুঝলি?"

****

পরের দিন সকালে ভবেশবাবু অভ্যেসমতন এককাপ চা খেতে এসে ঘরের কোণে রাখা মূর্তিটাকে দেখে ভ্রু কুঁচকে ফেললেন, "এটা আবার কোত্থেকে জোটালে, অতীন?"

ভবেশ ভট্টাচার্য অতীনের বাবা অজয় মুখুজ্জের বাল্যবন্ধু, প্রায় ঘুনসি পরার সময়কার ইয়ারি, আর কি! সেই থেকে ভদ্রলোক অতীনের বাড়ির একজন হয়ে গেছেন। ইতিহাসের প্রফেসর ছিলেন, সদ্য রিটায়ার করেছেন। অকৃতদার, গোঁড়া ব্রাহ্মণ এই ভদ্রলোকের একমাত্র নেশা বই। অতীনের মা এঁকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, দাদা বলে ডাকতেন ও মান্য করতেন। তবে এ বাড়িতে এঁর সবচেয়ে বড় পরিচিতি হচ্ছে যে ইনি অতীনের ঠাকুর্দা, বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আশুতোষ মুখার্জির প্রিয়তম শিষ্য। দরিদ্র উদ্বাস্তু পরিবারের এই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রটিকে আশুতোষবাবু প্রায় বুকে তুলে মানুষ করেছেন। শোনা যায় এককালে কিশোর ভবেশের খাওয়াপরার খরচাও আশুতোষবাবু নিজের পকেট থেকে দিতেন। ভবেশবাবু অবশ্য নিরাশ করেননি শিক্ষাগুরুকে, বিএ, এমএ, দুটোতেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে এলাকার মুখোজ্জ্বল করেন। আধা খ্যাপাটে, আজীবন ব্যাচেলর এই ইতিহাসের প্রোফেসরটি এলাকাতে যুগপৎ ভীতি ও সম্মানের উদ্রেক করে থাকেন। তবে মুখুজ্জে পরিবারের প্রতি এঁর আজন্মলালিত টান আজও যায় নি। রোজ সকালে আসেন, এককাপ চা খান, অতীনের কুশল মঙ্গল জিজ্ঞেস করেন, তারপর পাড়ার লাইব্রেরিতে গিয়ে বসেন। এঁর জন্যেই অতীনের মনে হয় মাথার ওপর একটা ছাদ এখনও যেতে যেতেও যায় নি।

ভবেশবাবু যখন প্রশ্নটা করেন, তখন অতীন স্নান করে এসে তোয়ালে দিয়ে মাথা ঘষছিলো। হাসিমুখে বলে, "মূর্তিটা ভালো না কাকু? সুবেশের দোকান থেকে কাল নিয়ে এলাম । আরে আমার ওই বন্ধু, যার কিউরিওর দোকান আছে। আপনি দেখেছেন ওকে বেশ কয়েকবার।"

ভবেশবাবু মূর্তিটাকে দেখছিলেন, চোখ না সরিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন "কত পড়লো?"

অতীন হেসে ফেলে, "এখন এমনিতেই দিয়েছে, পরে পয়সা নেবে যদিও। কি করে ও মূর্তিটা পেলো সেটা কিন্তু একটা বেশ ইন্টারেস্টিং কিস্যা, শুনবেন নাকি?"

জবাবে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়েন ভবেশবাবু। অতীনও বেশ গুছিয়ে পুরো ঘটনাটি বিবৃত করে।

ততক্ষণে চায়ের তলানিটুকু অবধি খেয়ে মূর্তির কাছে গিয়ে অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে হাঁটু গেড়ে বসেছেন ভবেশবাবু। খানিকক্ষণ বাদে উঠে এসে নিজের চেয়ারে গম্ভীর মুখে বসে তারপর বলেন, "দেখো অতীন, যতটুকু বুঝলাম, এই মুর্তি কোনও সাধারণ দেবীমূর্তি নয়। সম্ভবত ইনি কোনও তান্ত্রিক মতের দেবী। স্যার, মানে তোমার দাদু তন্ত্রমন্ত্র নিয়েও যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন, জানো নিশ্চয়ই। তোমার বাবা অবশ্য কমিউনিস্ট হয়ে গিয়ে এসব আর বিশ্বাস করতো না। স্যার আমাকেও কিছু কিছু শিখিয়েছেন, যদিও সেসব আমার বিশেষ মনে নেই, তবে..." বলে জানলা দিয়ে আকাশের দিয়ে চেয়ে একটু অন্যমনস্কই হয়ে গেলেন ভবেশবাবু। তারপর খেই ফিরে পেয়ে বললেন, "যদ্দূর মনে হচ্ছে, বুঝলে, এটা তিব্বতের জিনিস, থারটিন্থ সেঞ্চুরির বা আশেপাশের। তখন ভারতে ইসলামিক আক্রমণ শুরু হয়েছে, তার চাপে বৌদ্ধরা বেশ কোনঠাসা। বৌদ্ধ গুরুরা যাবতীয় পুঁথিপত্র নিয়ে পালালেন তিব্বতে। তিব্বতী বুদ্ধধর্ম, বা বজ্রযান শাখা নতুন ইন্ধন পেয়ে আরও উজ্জীবিত হয়ে উঠলো। এটা ওই সময়েরই, কারণ এর মধ্যে কিছু হিন্দু ইনফ্লুয়েন্স দেখতে পাচ্ছি। তার আগেকার বজ্রযানমূর্তিতে এত হিন্দু ইনফ্লুয়েন্স... উঁহু, এটা ওই থার্টিন্থ বা ফোর্টিন্থ সেঞ্চুরিরই জিনিস হে। কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সটা কি, সেটাই ধরতে পারছি না", বেশ চিন্তিত দেখায় ভবেশ বাবুকে।

একটা টি শার্ট গলাতে গলাতে কৌতূহলী গলায় প্রশ্ন করে অতীন, "বজ্রযান বলতে?"

ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক দৃশ্যতই ভারি খুশি হয়ে ওঠেন, "বলি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসটা মনে আছে তো? ফোর্থ সেঞ্চুরি বিসিতেই বৌদ্ধধর্ম দুটো ভাগ হয়ে গেলো, হীনযান অ্যান্ড মহাযান। অনেকে আবার এই হীনযান না বলে থেরবাদী বুদ্ধিজম বলেন, যদিও দুটো আলাদা, বুঝলে? তা বৌদ্ধধর্ম তো তারপর এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। যখন, ধরো থার্ড বা ফোর্থ সেঞ্চুরিতে বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রবেশ করলো, তখন তার সঙ্গে স্থানীয় বঁ বা বন উপজাতির শামানিস্ট ধর্মগুরুদের সঙ্গে লাগলো লড়াই। এরপর নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে, তরাই, উত্তর বিহার অ্যান্ড উত্তর বেঙ্গল, সিকিম, ইত্যাদি জায়গায় প্রচলিত বিভিন্ন তান্ত্রিক রিচুয়ালস আত্মীকরণ করে তিব্বতে মহাযানের নতুন রূপ হয়, নাম হয় বজ্রযান। এই বুদ্ধমত কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত। বিচিত্র সব দেবদেবীর পূজা, মুদ্রা মন্ত্র ও মণ্ডল নিয়ে নানা গোপন রিচুয়ালস, এই হলো এদের মুখ্য ধর্মাচরণ। বজ্র অর্থে কিন্তু এখানে ডায়ামণ্ড বা হীরে, ভাবার্থে ঈশ্বরপ্রাপ্তির পক্ষে সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং শক্তপোক্ত যান বা বাহন। ওদের ভাষায় বলে দোরজে।

"বজ্রযান যাকে বলে সত্যিকারের স্টেট রিলিজিয়ন হয়ে ওঠে সিক্স ফিফটি নাগাদ, তিব্বতের তেত্রিশতম রাজা সং-শেন-গাম্পোর সময়ে, যিনি দুইজন বৌদ্ধ প্রিন্সেসকে বিয়ে করেন,একজন চায়নার, একজন নেপালের। এরপর আটশো সতেরো নাগাদ তিব্বতে আসেন তিব্বতীয় বুদ্ধিজমের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র, গুরু পদ্মসম্ভব, ওরা বলে গুরু রিনপোচে। তান্ত্রিক বুদ্ধিজম নেভার হ্যাড টু লুক ব্যাক ফ্রম দেন। বাংলা আর বিহারে তখন পালরাজাদের আমল।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনছিলো অতীন। ভবেশবাবু থামলে বলে উঠলো "আর ইয়ে, অতীশ দীপঙ্কর বলে আরও কে একজনও যেন গেছিলেন না?"

মোটা চশমার ওপর দিয়ে ভবেশবাবু খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে অতীনকে নিরীক্ষণ করেন, তারপর রুমাল বের করে কপালের ঘাম মোছেন, "অতীশ দীপঙ্করকে ‘কে একজন’ বলছো অতীন? আমাদের বাঙালিদের দুর্ভাগ্য, আমরা পৃথিবীর খবর রেখে বিশ্বনাগরিক সাজতে ভালোবাসি, কিন্তু নিজেদের ইতিহাস জানি না। বা জানলেও বলতে লজ্জা পাই। বলি বাঙালিদের মধ্যে অমন মেধাসম্পন্ন, ধীশক্তির লোক খুব কমই জন্মেছেন, সেটা জানো কি? হ্যাঁ, উনিও তিব্বতে যান ধর্মপ্রচার করতে, খুব সম্ভবত হাজার বেয়াল্লিশ সাল নাগাদ।"

অতীন একটু মিইয়ে গেছিলো। ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলে, "তা এর সঙ্গে এই মূর্তির সম্পর্ক?"

ভবেশবাবু একটু গম্ভীর হয়ে যান। "তান্ত্রিক বুদ্ধিজম বিশাল শাস্ত্র হে। উড্ডীয়ান, কামাখ্যা, শ্রীহট্ট অর্থাৎ সিলেট ও পূর্ণগিরি, এই পাঁচটি হচ্ছে তান্ত্রিক বুদ্ধিজমের সবচেয়ে রেসপেকটেড প্লেস। এই মতে তথাগত বুদ্ধের অবদান যতটা, ততটাই অবদান বাংলার তন্ত্রসাধনার ঐতিহ্যের। বাংলার মাতৃসাধনাকেন্দ্রিক তন্ত্রাচারে যেমন অনেক ভয়ানক ও শক্তিশালী দেবদেবীদের নাম শুনেছো, এখানেও একই কেস। এই মতে আদিবুদ্ধের পাঁচটি ধ্যানমূর্তি আছে, বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য। এঁদের প্রত্যেকের আবার বিভিন্ন মন্ত্রপদ, মুদ্রা, বাহন এবং প্রতীকচিহ্ন আছে। আর বিভিন্ন মূর্তির জন্যে আছেন বিভিন্ন শক্তি, মানে দেবীরা। এঁদের অনেকেই খুব রাগী এবং

ভয়ংকর। যেমন বজ্রবারাহী, হেরুক বা তাঁর বিভিন্ন রূপ যেমন বুদ্ধকপাল সম্বর, এছাড়া যমারি, বজ্রচর্চিকা, ইত্যাদি।

খেয়াল করলে দেখা যায় হিন্দু তন্ত্রের সঙ্গে এই সব দেবদেবীদের কোথাও একটা যোগসূত্র আছেই। অনেক তন্ত্রের নামও একই, যেমন ধরো ভূতডামর। অনেক দেবদেবীদের নামও সেম, যেমন মহামায়া। কোনও কোনও জায়গায় নাম এক না হলেও মূর্তি এক, যেমন দেবী বজ্রযোগিনীর বর্ণনা এক্কেবারে দেবী ছিন্নমস্তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।"

এতটা বলে থেমে যান ভবেশ বাবু, তারপর উঠে দাঁড়ান, "কিন্তু এই মূর্তিটা স্পেশাল হে। কোন ক্যাটেগরিতে ফেলবো বুঝতে পারছি না। দাঁড়াও বাপু, একটু পড়াশোনা করে নিই। কোথায় যে এর রেফারেন্স পাবো..." বলতে বলতে দরজার দিকে এগিয়ে যান বৃদ্ধ প্রফেসর, "তদ্দিন আর বিশেষ নাড়াঘাঁটা করো না বাপু, কোথাও একটা ক্যাচ আছে, বুঝলে। অদ্ভুত দেবীমূর্তি, দোকানদার তোমাকে এমনিই দিয়ে দিলো, তাকে আবার পুরোনো জমিদারবাড়ির তান্ত্রিক পুরোহিত এমনিতেই দিয়েছে, না হে, কিছু তো একটা..."

সেদিন রাতেই অতীন স্বপ্নে দেখলো এক দেবীমূর্তি। অসাধারণ অপরূপা এক দেবী অতীনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলছেন "আমাকে এভাবে রেখো না অতীন। যখন ঘরে এনেছো, আমার পূজা করো। তোমার কল্যাণ হবে।"

পরপর তিনরাত ঠিক একই স্বপ্ন দেখলো অতীন।

****

কয়েকদিন বাইরে গেছিলেন ভবেশবাবু, একটা সেমিনারে যোগ দিতে। যেদিন ফেরেন, সেইদিন সন্ধ্যে নাগাদ অতীনের বাড়িতে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন ভবেশবাবু।

বাইরের বসার ঘর থেকেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে অতীনের স্টাডি রুমের একটা দিক সাফসুতরো করে সেখানে একটা কাঠের জলচৌকি রাখা, তার ওপর লাল চেলি বিছিয়ে সেই দেবীমূর্তি, গলায় রক্তজবার মালা। ধূপ আর গুগগুলের গন্ধ এতদূর থেকেও পাওয়া যাচ্ছে।

অতীন অফিস থেকে ফিরে স্নান করে এদিকেই আসছিলো, ভবেশবাবুকে দেখে একটু সঙ্কুচিতই হয়ে পড়ে, চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলে, "আসুন কাকু, বসুন", বলেই পুষ্পদির উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ে চা দিয়ে যাবার জন্যে।

ভবেশবাবু তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসেন, অতীনের পরনের লাল লুঙ্গিটি লক্ষ্য করেন, তারপর তীক্ষ্ণ চোখে অতীনকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি চা খাবে না?"

অতীন একটু বিব্রত হাসি হেসে বলে "না কাকু, আমি একেবারে পুজো দিয়ে খাবো।"

ভবেশবাবু অত্যন্ত বিস্মিত হ'ন, "সে কি হে? পুজো দিয়ে খাবে মানে? তোমার আবার ধম্মেকম্মে মতি হলো কবে থেকে, অ্যাঁ? তুমি কলেজে এস এফ আই করতে না? তুমি নাকি ফার্স্টইয়ারে পড়ার সময় পৈতে দিয়ে জুতোর ফিতে বানিয়েছিলে? তা হঠাৎ এখন আবার এদিকে?"

অতীন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকে, তারপর স্বপ্নাদেশের পুরো কথাটা খুলে বলে ভবেশবাবুকে।

ভবেশবাবু ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে অতীনের দিকে, তারপর বলেন, "দেখো অতীন, আমি একটু প্রাচীনপন্থী লোক, জনোই তো। এই নিয়ে তোমার বাবার সঙ্গে আমার কম ঝামেলা লাগত না। আমি স্বপ্নাদেশ মানি বলবো না, তবে এখনও যে অনেক কিছুই যুক্তি দিয়ে এক্সপ্লেইন করা যায় না সেটা মানি। বামুনের ছেলে, পুজোআচ্চায় মতি হয়েছে সে ভালোই, আমি তোমাকে আটকাবো না। তবে..."

"তবে কি কাকাবাবু?"

"তোমার মতন বামপন্থী রাজনীতি করা ছেলে তিনদিনের স্বপ্নাদেশেই এক্কেবারে মাথা মুড়িয়ে বামাক্ষ্যাপা হয়ে গেলে, জানি না কেন বাপু, আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছে হে। এসব বুড়ো বয়সে হয় বাবা, তখন মনের জোর কমে যায়, মৃত্যুভয় আসে। তখন মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করা শুরু করে। তোমার তো সে বয়েস হয় নি বাপু। কেসটা কি খুলে বলো দেখি, হ্যাঁ?" -এই বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অতীনের দিকে তাকিয়ে থাকেন বৃদ্ধ ভূয়োদর্শী অধ্যাপকটি। অতীনের চোখদুটো একটু লাল আর অস্থির অস্থির মনে হয় ওঁর। গালে দাড়ি, একটু অবিন্যস্ত ভাব, ডাক্তার দেখাবেন নাকি? না থাক, আজকালকার ছেলে, কি মনে করে বসবে। উনি পরের প্রসঙ্গে যান,

"আরও একটা কথা, বলি এই মূর্তিটাই পেলে পুজো করার জন্যে? এখনও তো জানাই গেলো না ইনি কে, কার মূর্তি। প্রত্যেক দেবদেবীদের পূজাপদ্ধতি আলাদা হয় অতীন। বীজমন্ত্র আলাদা হয়, প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র আলাদা হয়। একের মন্ত্রে অন্যের পুজো করলে এঁরা কুপিত হন। তুমি মোড়ের কালীমন্দিরের ঠাকুরমশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলে এই পুজো করা নিয়ে? কিভাবে কি করতে হয় জানো কিছু?"

অতীন আরও বিব্রত হয়ে পড়ে, "না কাকু, কারও সঙ্গেই কথা হয়নি। আমার মনে হলো সব দেবীই তো শক্তির অংশ, মাতৃমূর্তি, তাহলে আর অত ইয়ে মেনে চলে কি হবে? আমি নিজের মতন করে একটু পুজোটুজো করে নিই। ওই আর কি, ধূপধুনো ফুল মালা আর কিছু ফলপ্রসাদ।"

ভবেশবাবু উত্তেজিত হয়ে পড়েন, "ওহে তুমি কি সাধক রামপ্রসাদ না স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ, যে 'মা মা' বলে কাঁদলেই মহামায়া নিজে এসে বেড়া বেঁধে দেবেন? স্পষ্ট বলছি যে এটা তান্ত্রিকমূর্তি, বৌদ্ধতন্ত্র নিয়ে সামান্যতম আইডিয়া আছে তোমার? কোথা থেকে কি হয়ে যাবে কোনও ধারণা আছে? এ কি ছেলেখেলা নাকি, অ্যাঁ? আরে আমি খোঁজ লাগাচ্ছি বাপু, বিদেশের বেশ কিছু ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের সঙ্গেও কথা চলছে এই মূর্তিটা নিয়ে। এ অত্যন্ত ইউনিক মূর্তি বাপু, এর আলাদা হিস্ট্রি আছে। সে সব না জেনেবুঝে এমন সময়ে হুটপাট করে কিছু একটা করে বসার কোনও দরকার আছে কিছু, অ্যাঁ?"

খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ করে থেকে চোখ তোলে অতীন, ভবেশ বাবুর বুকটা ধ্বক করে ওঠে, দুমিনিটের মধ্যে ওর চোখ দুটো অত লাল হয়ে গেলো কি করে? চোখের মণি দুটো অত ওপরের দিকে ওঠা কেন?

অপরিচিত একটা ঘষা গলায় অতীন বলে, "মায়ের পুজোয় বাধা দেবেন না কাকু, প্লিজ, মা আমাকে ডাকেন, ভালোবাসেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, মা আমার ভালো চান, আমাকে দেখেন, আমার সেবাযত্ন নেন, মা আমাকে চান, মা আমার সব বোঝেন, মা আমাকে ভালোবাসেন, মা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, আপনি বুঝবেন না কাকু..."

সেই স্বগত প্রলাপোক্তির মধ্যে ভ্রু কুঁচকে উঠে দাঁড়ান ভবেশ ভট্টাচার্য। নিজে অকৃতদার হলে কি হবে, অতীন ওঁর নিজের সন্তানতুল্য। আসন্ন অমঙ্গলের একটা আবছায়া আভাস পেলেন ভবেশবাবু, তারপর ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলেন।

ভালো না, ভয়ংকর একটা কালো ঝড় ধেয়ে আসছে, স্পষ্ট বুঝতে পারলেন সেই বৃদ্ধ প্রফেসর, তারপর চোয়ালটা শক্ত করলেন। ঠিক হ্যায়, দেখা যাক কে যেতে, উদ্ভট এই মূর্তির উৎকট "মাতৃস্নেহ", না উদ্বাস্তু বাঙালের জেদ।

বেরিয়ে আসার সময় ভবেশবাবু দেখলেন যে পুষ্পদি উদ্বিগ্নমুখে তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছেন দরজার কাছে, ফিসফিস করে বলেন, "ও দাদা, অতুকে একটা ভালো দেখে ডাক্তার দেখাও না গো। ছেলেটা কেমন করছে ক'দিন থেকে। ভালো করে খায় না, ঘুমায় না। রাতদিন বিড়বিড় করে। আমি তো বাইরের ঘরে শুই, মাঝেমাঝে ঘুম থেকে উঠে শুনি কেমন অদ্ভুত গলায় ‘মা মা’ বলে কাঁদছে। আমার বুকটা ধড়ফড় করে গো, ভয় লাগে। তখন না, ডাকলে সাড়া অবধি দেয় না। ছেলেটা কি পাগল হয়ে গেলো দাদা, হ্যাঁ? ওর মা যে মরে যাবার সময় আমার হাত ধরে বলে গেলো, ছেলেটাকে দেখো পুষ্প। অতুর যদি কিছু হয়ে যায়? মরে গিয়ে দিদিকে কি জবাব দেবো দাদা? ও দাদা, আমার বলার মতন আর কেউ নেই গো, তুমিই কিছু করো না গো", বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন সেই প্রৌঢ়া।

সন্তানহীনা, রক্তের সম্পর্কে অনাত্মীয়া সেই স্নেহশীলা মহিলাটির মাথায় একবার হাত রাখেন ভবেশবাবু, তারপর বেরিয়ে যান।

সেই রাতেই ফের স্বপ্নাদেশ পেলো অতীন। সেই অপরূপ নারীমূর্তি অতীনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলছে "বড় খিদে পেয়েছে অতীন, কিছু খেতে দাও, আমাকে কিছু খেতে দাওওও।"

সাপের শিষের মত সেই আর্তকামনার মধ্যে মিশে ছিল কিছু কি বিপজ্জনক বিষশিখা? অতীন দেখলো যে সে নিজে মূর্তির পায়ের কাছে সাপের মতন আকৃতি নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে মাটিতে শুয়ে, সে ফণার মতন নিজের মাথাটি দুহাত জড়ো করে বলছে, "কি খাবেন মা? যা চাইবেন, আমি তাই এনে দেবো, একবার শুধু বলুন, কি খাবেন মা?"

সেই অপরূপা নারীমূর্তি অদ্ভুত হেসে বললেন "খাবার খাবো অতীন। যে সে খাবার নয়, মহাক্ষুধা আমার। আমাকে জাগিয়েছো অনেক কাল পরে, তবুও জিজ্ঞেস করছো অতীন? আমার শরীর দেখোনি অতীন?"

"কি চাই মা আপনার?"

"ভোগ, মহাভোগ!"

****

এর কয়েকদিন বাদে যেদিন ডামরীকে ঘরে নিয়ে এলো অতীন সেদিনটা ছিলো মঙ্গলবার, তার ওপর ছিলো অমাবস্যা, ভোরের দিকে আংশিক সূর্যগ্রহণও ছিলো।

নাহ, অতীনের চরিত্র যথেষ্ট পরিষ্কার। তা সত্ত্বেও এই ঘটনাটা কি করে ঘটে গেলো সেটা পুষ্পদি বা ভবেশবাবু কেউই বুঝে উঠতে পারলেন না।

রায়চক র‍্যাডিসন ফোর্টে অতীনের কম্পানীর একটা কনফারেন্স চলছিলো। দুদিনের প্রোগ্রাম, দ্বিতীয় দিনের শেষে গালা ককটেল ডিনার। সেলসের ছেলেগুলো এমনিতেই মালখোর পাবলিক, তার ওপর কম্পানীর পয়সায় দামি স্কচ ফ্রিতে পেয়ে কপাল অবধি মদ খায়। তারপর মাঝরাত্তির অবধি হুল্লোড় করে পরের দিন সকালে ফেরা। প্রতি বছরেই এই হয়, গত বছর অবধি অতীন এদের সঙ্গে সারা রাত হুল্লোড় করেছে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ রিজিওনাল ম্যানেজার সাহেব নিজের হাতে সবাইকে স্কচের পেগ বানিয়ে দিয়েছেন, তারপর ডিজে চালিয়ে সমবেত উল্লাসনৃত্য।

কিন্তু এই মাসখানেক ধরে অতীনের এসব ভালো লাগে না। কিছুই ভালো লাগে না। ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে না, কথা বলতে ভালো লাগে না, রেসের মাঠে যেতে ইচ্ছে করে না, সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে না, আড্ডা দিতে ভালো লাগে না, সুবেশের দোকানে যেতে ভালো লাগে না, মানুষের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে না, হাসতে ইচ্ছে করে না, আনন্দ করতে ইচ্ছে করেনা, এমন কি দুঃখ পেতেও ইচ্ছে করে না!

তার সমগ্র চৈতন্য, সত্ত্বা জুড়ে সেই মূর্তি। মা খেয়েছেন? মা কি খুশি? মা তৃপ্ত হয়েছেন? আজ মা কখন ঘুমোতে যাবেন? মায়ের কি আজকের ভোগ পছন্দ হয় নি? মা কেন আজও গ্রহণ করলেন না?

তার কাজে মন নেই। তার পারিপার্শ্বিক কিছুতে কোনও উৎসাহ নেই। সদাসর্বদা সেই দেবীমূর্তি তার সমস্ত অস্তিত্ব অধিকার করে নিয়েছে, এই একমাসের মধ্যেই। তার বেশভূষা বেশ শৌখিন ছিলো এককালে। একই শার্ট সে পরপর দুদিন পরেনি কখনও, কাচা ইস্ত্রি করা শার্ট প্যান্ট ছাড়া তার চলতো না। এখন তাকে চেনাপরিচিত কেউ দেখলে চমকে ওঠে। অনেকদিনের না কামানো দাড়ি, গাল গেছে ভেঙে। উলোঝুলো চুলগুলোকে কোনওমতে শান্ত করে রাখার চেষ্টা। জামাকাপড় কাচাকুচি বা ইস্ত্রির বালাই বিশেষ নেই, গা থেকে পুরোনো ঘামের টকপচা গন্ধ ছাড়ে। অফিস না যেতে হলে জুতোর বদলে হাওয়াই চপ্পলই চলে। কোনও দিকে কোনও হুঁশ নেই, কোনও খেয়াল নেই, কোনও বন্ধন বা আসক্তি নেই, ভালোবাসা নেই, ঘৃণা নেই, জীবনের স্বাদ নেই, মৃত্যুর ভয়ও নেই!

সুবেশ এসেছিলো এ বাড়িতে, অনেকদিন অতীন ওর দোকানে যায়নি বলে খবর নিতে এসেছিলো। কথা বলাবার অনেক চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে উঠে গেছে। যাওয়ার সময় পুষ্পদিকে আলাদা করে ডেকে নিজের নাম্বার দিয়ে বলে গেছে দরকার হলে ফোন করতে।

অফিসেও এই নিয়ে কথা চলছে কলীগদের মধ্যে, বোঝে অতীন। হাসিখুশি ছেলেটার এই হঠাৎ পরিবর্তন কারোরই নজর এড়ায় নি। রিজিওনাল ম্যানেজার সাহেব বাঙালি, খুবই মাইডিয়ার মানুষ। তিনিও কেবিনে ডেকে জানার চেষ্টা করেছেন, হঠাৎ এই হাল কেন। অতীন জবাব দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত,

রিক্ত, বিরক্ত। এই অকারণ জগতের অহৈতুকী কর্মব্যস্ততা, কৌতূহল, এসব নিয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন।

তার চালচলন বদলে যায় শুধু রাত্রিবেলায়। চোখে আসে উজ্জ্বল দীপ্তি। তখন সে স্নান করে একাগ্রচিত্তে পূজায় বসে। অনেক রাত অবধি পূজাপাঠ করে সে নিজে খেতে যায়, তার আগে সেই দেবীমূর্তির সামনে সযত্নে সাজিয়ে দিয়ে যায় ভোগ!

বিশেষ কিছুই না, যা যা তার বাড়িতে রান্না হয়, ঠিক তাই তাই সে সাজিয়ে দিয়ে যায় থালায়। তার বিশ্বাস ছেলে যা খায়, মা-ও তাইই খাবেন নিশ্চয়ই।

পরের দিন সকালে উঠে দেখে ভোগ যেমনকার তেমনই, দেখে সে মুষড়ে পড়ে। আজও মা তার ভোগ গ্রহণ করলেন না? আর কতদিন মা তার সন্তানের পরীক্ষা নেবেন?

তারপর সেই মহাপ্রসাদ খেয়ে সে অফিসে যায়।

ভবেশবাবু পাড়ার মোড়ের পুরোহিত মশাইকে ডেকে এনেছিলেন একদিন, তিনি তো মূর্তি চিনতে পারলেনই না, উলটে অতীনের কার্যকলাপ দেখে স্তম্ভিত। প্রবীণ পুরোহিত, বহুদিন এপাড়াতে পুজো করেন, অতীনকে চোখের সামনে বড় হতে দেখেছেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে অতীনের হাত চেপে ধরলেন, "বাবা, একাজ করো না, নিষেধ করছি। ইনি কে চিনতে পারছিনা, এনার বীজমন্ত্র জানা নেই। এভাবে দেবীর পূজা করতে নেই, বাবা, ওনারা কুপিত হন। ইনি দশমহাবিদ্যার কেউ, নাকি অষ্টদেবীর, নাকি চৌষট্টি যোগিনীদের মধ্যে একজন, তার কিছুই জানা নেই। তার ওপর তিব্বতীয় মূর্তি, ওদের তান্ত্রিকপন্থা বড় সাংঘাতিক বাবা। অনেক অপদেবী, ডাকিনীবিদ্যার উল্লেখ আছে, আলাদা পূজোপকরণ লাগে, বিভিন্ন মুদ্রা আছে, যৌগিক মণ্ডল আছে। লক্ষ্মী বাবা, তুমি এঁকে সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। কোথা থেকে কি অনর্থ হয়ে যাবে..."

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল অতীন, সেই অপার্থিব হাসি শুনে থমকে গেছিলেন প্রবীণ পুরোহিত, হাসতে হাসতে অতীন বলেছিল, "মায়েপোয়ের ব্যাপার কাকু, টেনশন নেবেন না। মা আমার সঙ্গে কথা বলেন, হাসেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, ভালোবাসেন। খাবেন, মা একদিন নিশ্চয়ই খাবেন আমার বেড়ে দেওয়া ভোগ, আমি আপনাকে দেখাবো কাকু। আপনি শুনতে পাচ্ছেন মায়ের ডাক? শুনতে পাচ্ছেন?"

বৃদ্ধ পুরোহিত প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন, "তুমি শান্ত হও, বাবা। এভাবে হয় না। ওভাবে খাবার বেড়ে দিলে দেবী তা গ্রহণ করেন না। ভোগ নিবেদনের পদ্ধতি আছে, মন্ত্র আছে, নিয়ম আছে..."

পুরোহিতকে টেনে বাইরে এনেছিলেন ভবেশবাবু। কিছু কথা হয়, কেউ জানে না তার ব্যাপারে বিশেষ।

তা অনেক জোরাজুরি সত্ত্বেও মিটিং শেষ হতেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল অতীন। রাতে মাকে ভোগ না দিলে তার খাওয়া, ঘুম এসব হয় না। ফলে বেশ দ্রুতই গাড়ি চালিয়ে আসছিল সে। মধ্য নভেম্বরের সন্ধ্যা, গ্রামগঞ্জ এলাকা, ঘন কুয়াশা ছেয়ে আছে রাস্তায়, তার ওপর অমাবস্যার অন্ধকার। দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। রাস্তাঘাট জনশূন্য, কুকুর অব্দি দেখা যাচ্ছে না।

মাঝেমধ্যে রাস্তার পাশের বন্ধ দোকানঘরের শাটারের নিচ থেকে আলোর আর মৃদু গুঞ্জনের আভাস পাওয়া যায়, বোঝা যায় দেশি মৌতাতের আসর বসেছে।

সরিষা পেরিয়ে শিরাকোল- শেরপুর রোডের মোড় থেকে বাঁদিক বেঁকে খানিকটা এসেই গাড়ি স্লো করতে বাধ্য হলো অতীন। রাস্তার মাঝখানে এক মহিলা অসহায়ের মতন হাত তুলে গাড়িটাকে থামতে বলছেন।

অন্য সময় হলে অতীন স্রেফ গাড়ি না থামিয়ে বেরিয়ে যেতো, হাইওয়ে ডাকাতির জন্যে খুবই কুখ্যাত এই অঞ্চল। অনেক তরিকা আছে এইসব গ্যাঙেদের লুটতরাজ চালাবার জন্যে।

কিন্তু কিছু একটা ভেবে মহিলার কাছে এসে গাড়ি থামায় অতীন, "কি হয়েছে? গাড়ি থামালেন কেন?"

মহিলা ড্রাইভারের দিকে উইন্ডোর পাশে আসেন, কাঁচ নামায় অতীন, কাঁদতে কাঁদতে মহিলাটি বলেন, "আমার খুব বিপদ বাবু, আমাকে বাঁচান। আমার কেউ নেই, কোথাও যাওয়ার নেই, দেওররা এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। সারাদিন কিছু খাইনি, বাবু। আমাকে বাঁচান, বাবু"।

গাড়ি লক করে নেমে আসে অতীন, কম্পানি থেকে রাতের খাবার প্যাক করে দিয়েছিল, সেটা তুলে দেয় মহিলাটির হাতে।

মহিলা গোগ্রাসে বুভুক্ষুর মতন গিলতে থাকেন খাবার, বোঝাই যায় যে অনেকক্ষণ, বা সারাদিনই হয়তো কিছু খাননি। বেশভূষায় দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। চাপা গায়ের রঙ, উষ্কখুষ্ক চুল, ম্লান বৈধব্যবেশ সত্ত্বেও মধ্যবয়স্কা মহিলাটির আঁটোসাঁটো গড়নটির দিকে অতীনের চোখ চলেই যায়। যৌবনকালে বেশ সুশ্রী ছিলেন মনে হয়। এখন বোধহয় সহায়হীনা মহিলাটির দেখভাল করার কেউ নেই। দুমুঠো ভাতের দায় ঝেড়ে ফেলেছে পরিবার পরিজন।

খাওয়া শেষ হলে জলের বোতল এগিয়ে দেয় অতীন। ভদ্রমহিলা হাত ধুয়ে ঢকঢক করে অনেকটা জল খান। তারপর হঠাৎ করে রাস্তায় শুয়ে অতীনের পা জড়িয়ে ধরেন, "আমাকে বাঁচান, বাবু, আমার তিনকুলে কেউ নেই, আমার কোথাও যাওয়ার নেই। শেয়াল কুকুরে আমাকে ছিঁড়ে খাবে, বাবু। ও বাবু, আমাকে ফেলবেন না, বাবু। আমি সব কাজ পারি, ঘর মোঝা, বাসনমাজা, জলতোলা, সব পারি, বাবু। বামুনের মেয়ে বটে আমি, রান্নার কাজও পারি। আমাকে ফেলে যাবেন না, বাবু, ধর্মসাক্ষী বাবু, দুমুঠো খেতে দেবেন বাবু, পরনের কাপড় একটা.... বাবু, ও বাবু..."

অবিবেচক বা হঠকারী বলে অতীনের কোনওদিন কোনও দুর্নাম ছিল না। কিন্তু এই অপার্থিব শীতের রাতে অতীনের চিন্তাভাবনা কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলো। পায়ের নিচে মৃত অজগরের মতন শুয়ে আছে শীতল ডায়মন্ড হারবার রোড, দুধারের খালি মাঠ থেকে ঘন ধোঁয়ার মতো উঠে আসছে শীতের অশরীরী কুয়াশা, দূরে নির্বাক হাতির পালের মতন দাঁড়িয়ে গাছপালার জঙ্গল। মাথার ওপর দিগন্ত থেকে দিগন্তে অপার হয়ে শুয়ে আছে কালচে নীল নভেম্বরের আকাশ, ওটা কি ক্যাসিওপিয়া? নিজেই ভাবে অতীন। নিশ্ছিদ্র, নিঃসীম এই পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে কোনও শব্দ নেই, কোনও প্রাণের সাড়া নেই, কোনও দিশা নেই, মুক্তি নেই, পাপ নেই, পূণ্য নেই, শুধু পায়ের কাছে এই রমণীর ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ।

অতীনের সমগ্র চৈতন্য যেন ক্রমশ গলে যেতে থাকে। কালো লোমশ এক ছায়া যেন তার সমস্ত চিন্তা আবৃত করতে থাকে, অতীনের সব বোধ বুদ্ধি যেন নিমেষে মাথায় শিকড় পড়া সাপের মতন নুইয়ে আসতে থাকে...

এ যদি মায়ের আদেশ হয়? মা যদি এইভাবেই তার সন্তানের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন? কি করবে অতীন? নারী মাত্রেই মায়ের অংশ না? একে উপেক্ষা করে চলে যাবে? নাকি নিয়েই যাবে? কি দরকার... কোথাকার কে না কে, খায় নি অনেকক্ষণ, খাইয়ে দিয়েছে অতীন, গাড়ি করে বেরিয়ে গেলেই হলো...না কি...না থাক... রান্নার কাজে অন্তত...পুষ্পদির একজন হেল্পিংহ্যান্ড...

মহিলাটিকে উঠিয়ে দাঁড় করায় অতীন, "রান্নার কাজ পারো?"

"হ্যাঁ বাবু" সংক্ষিপ্ত উত্তর।

"চলো তাহলে, সঙ্গে কিছু নেবার আছে?"

"না বাবু"

একটা খটকা যেন অতীনের মনের দরজায় ঘা মেরেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে উড়ে যায়, কিছুই নেই নেওয়ার মতন? কিচ্ছু না? নিদেনপক্ষে একটা পুঁটুলি? লোকে এমন নিঃস্ব হয়ে ঘর ছাড়ে নাকি?

"কি নাম তোমার"

সেই নিঃসীম শূন্য কালোর মধ্যে, দিগন্তবৃত্তের নীলচে আভার প্রেক্ষাপটে, উড়তে থাকা শুকনো চুলের মধ্যে ঝিকিয়ে ওঠে মহিলার শ্বদন্তদুটি,

" ডামরী, আমার নাম ডামরী বাবু"।

****

ডামরীকে নিয়ে রাতে ঘরে ঢুকতে দেখে ভ্রু কুঁচকে ফেলেছিলেন পুষ্পদি, "এ কাকে নিয়ে এলি অতীন?"

ডামরী জড়োসড়ো হয়ে এক কোণায় দাঁড়িয়েছিল। জুতো খুলতে খুলতে পুরো ব্যাপারটা অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে জানায় অতীন। তারপর পুষ্পদিকে বলে, "চিলেকোঠার ঘরটা খুলে দিও পুষ্পদি। ডামরী ওখানেই থাকবে। আর হ্যাঁ, এবার থেকে রান্নাবান্নার কাজটা ওইই করবে, ওকে সব দেখিয়ে টেখিয়ে দিও।" তারপর ডামরীর দিকে ঘুরে বলে, "আজকের রাতটা কোনও মতে চালিয়ে নাও, কাল পুষ্পদি লোক ডেকে পরিষ্কার করে দেবে ঘরটা। যা যা লাগবে পুষ্পদিকে বলবে আর পুষ্পদির কথা মত চলবে। পুষ্পদির কথা মতই সব কাজ হয় এবাড়িতে।"

অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে ডামরীকে নিয়ে ওপরে উঠে যান পুষ্পদি। খানিকক্ষণ বাদে নেমে এসে ফেটে পড়েন অতীনের ওপর, "তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে অতীন? কোথাকার কে জানাশোনা নেই,

কোন অজাত বেজাতের মেয়ে, পাগল না কি কিছু জানিস তুই? বলি চোর বা গুণ্ডাদেরও লোক তো হতে পারে। রাস্তায় ধরলো বলে নিয়ে চলে এলি? বুদ্ধি বিবেচনা সবই কি ওই মূর্তি খেয়ে নিয়েছে?"

দ্রুত চোখ তুলে তাকায় অতীন, আর সেই মুহূর্তের মধ্যে লাল হওয়ে যাওয়া চোখ দেখে বুকটা ধ্বক করে ওঠে পুষ্পদি'র, ভয়ে সিঁটিয়ে যান উনি। " মা ই ওকে জুটিয়ে দিয়েছেন পুষ্পদি। মায়ের আদেশ অমান্য করা যায় না সে তো তুমি জানোই। দেখো, ওর যেন কোনও অসুবিধা না হয়। আমাকে গামছাটা দিয়ে যাও, স্নান করতে যাবো। আমার খাবার আর মায়ের ভোগ রেডি করে রেখেছো তো?"

এই বলে সামান্য স্খলিত পায়ে বাথরুমের দিকে চলে যায় অতীন। পুষ্পদির সঙ্গে এই বোধহয় শেষ সামনাসামনি কথা হয় অতীনের।

কারণ সকালে উঠে দেখা যায় পুষ্পদির বিছানা খালি।

পুষ্পদি নেই।

****

পরের দিন সারা পাড়া ভেঙে পড়লো অতীনের বাড়িতে। এলাকায় তীব্র উত্তেজনা। মুখার্জী পরিবার এলাকার যথেষ্ট সম্মানীয় পরিবার। অতীনকেও লোকজন খুবই ভালোবাসে। আর পুষ্পদিকেও এলাকায় সবাই চেনে মুখার্জী বাড়িরই একজন বলে।

অতীন পুরো ঘটনায় হতচকিত হয়ে গেছিলো, কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলো না। শেষে ভবেশবাবুই এসে পুলিশে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

পুলিশ তোলপাড় করে ফেললো বটে, কিন্তু পুষ্পদির কোনও খোঁজ পাওয়া গেলো না।। কোথায় গেছেন, কি হয়েছে কেউই বলতে পারলো না। পুষ্পদি'র গ্রামের বাড়ি হাওড়ার ডোমজুড়ের কোথায় যেন, সেখান অবধি পুলিশ খোঁজ নিয়ে এলো, কিন্তু না, কোনও খবর নেই।

ভদ্রমহিলা একবস্ত্রে ঘর ছেড়ে চলে গেছেন, চপ্পল অবধি নিয়ে যাননি। একটিও নিজের জিনিস নিয়ে যাননি, একটা টাকা অবধি না। কলকাতা শহরের সমস্ত হাসপাতাল, নার্সিং হোম, মেন্টাল অ্যাসাইলাম, থানা সব খোঁজ নেওয়া হয়ে গেলো। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো, উঁহুঁ, কোনও পাত্তাই নেই।

পুলিশ এসে পাড়াপড়শিদের দুদিন জিজ্ঞাসাবাদ করলো। অতীন আর ভবেশবাবুর কাছ থেকে অনেক কিছু জানার চেষ্টা করলো, কিন্তু দুজনের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্বেও কোনও সূত্রই উদ্ধার করা গেলো না। ডামরীকে অবশ্য পুলিশ প্রথম দিনই ক্লিনচিট দিয়ে দেয়। কেউ কাউকে চেনে না, কয়েক ঘন্টার আলাপ। আর ক্রমাগত হাপুস নয়নে ক্রন্দনরত গ্রাম্য মহিলাকে কতক্ষণই বা জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়?

ভদ্রমহিলা যেন জাস্ট ভ্যানিশ করে গেলেন!

ভবেশবাবু ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছিলেন। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কিছু একটা অলৌকিক অশনি সঙ্কেত আছে বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু সে কথা পুলিশকে বলা চলে না, ওরা হেসেই উড়িয়ে দেবে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রথম দিককার ধাক্কা সামলে, অতীন কিন্তু খুব শান্ত ভাবেই ব্যাপারটা দেখছে। ঠাণ্ডা মাথায় পুলিশকে সাহায্য করা থেকে খবরের কাগজের অফিসে দৌড়াদৌড়ি করা, সবই সে করছে নিরাসক্ত দক্ষতার সঙ্গে।

তার কোনও বিকার নেই, যেন খুবই সহজচিত্তে মেনে নিয়েছে যে পুষ্পদি আর আসবে না, আর ফিরবে না, আর খেতে ডাকবে না, আর জামাকাপড় গুছিয়ে রাখবে না, আর অতীনের শরীর খারাপ হলে পাগলের মতো করবে না। নিঃসহায় বিধবা মাতৃসমা প্রৌঢ়াটির প্রতি সমস্ত দায়িত্ব যেন অতীন তার উদাসীন কর্তব্যকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। তার মন যেন অন্য এক প্রাপ্তির পূর্ণতায় মশগুল, সেখানে পুষ্পদির অস্তিত্বটাই অপ্রয়োজনীয়।

হায়, ভবেশবাবু যদি জানতেন, এর পেছনের কারণ! কোন আধিদৈবিক আকর্ষণ এখন অতীনের সমগ্র চৈতন্য জুড়ে বিরাজমান। পুষ্প হারিয়ে যাবার পরদিন থেকেই এ বাড়িতে প্রাত্যহিকী চা পানের আসরটি ত্যাগ করেছেন তিনি। ফলে এর কারণ জানে শুধু দুজন, অতীন আর ডামরী।

মা ভোগ স্বীকার করেছেন!

অতীন স্বীকার করতে বাধ্য, ডামরী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা। সেই চূড়ান্ত ডামাডোলের মধ্যেও সে বাড়ির সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে, তাকে রান্নাঘরের বা বাড়ির কোনও কাজই দেখিয়ে দিতে হয়নি। সে যেন সবই জানতো, যেন এ বাড়িতে সে বহুকাল ধরেই আছে। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সে কাজ করতে পারে। অতীনকে মুখ ফুটে কিছু চাইতেই হয় না, সে সবই যেন জানে বোঝে।

পুষ্পদি যেদিন হারিয়ে যান, সেদিন রান্না করেছিল ডামরী। অতীন স্নান করে পূজায় বসে, তারপর ভোগ উৎসর্গ করে মা'কে। তারপর অভ্যেস মতন বাইরে বেরিয়ে এসে স্টাডি রুমের দরজায় তালা দিয়ে দেয়।

রাতে খেতে বসে রান্নার স্বাদ একটু অন্যরকম লাগে অতীনের, কি ধরণের অন্যরকম, সেটা অবশ্য বলা মুশকিল। অবশ্য হতেই পারে, পুষ্পদির হাতের রান্না খেয়ে অভ্যস্ত অতীন। একে নতুন হাতের রান্না, তার ওপর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রান্নার স্টাইলটাই হয়তো অন্যরকম। তাছাড়া সেইদিন রান্নার স্বাদ নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থাতেই ছিল না অতীন। দ্রুত খাবার খেয়ে শুতে চলে যায়।

রাতে চুড়ির কিছু হালকা রিনিরিনি আওয়াজ এসেছিল কি অতীনের কানে? তারপর ছমছম করে নূপুরের শব্দ, কে যেন ছাদ থেকে নিচে নেমে আসছে আর উঠে যাচ্ছে... সেটাও কি ভুলই শুনলো নাকি, অতীন? খিলখিল হাসির শব্দও শুনতে পেলো কি একটা? কিন্তু সারাদিনের ঝোড়ো ক্লান্তির পর অতীনের দুচোখে ঘুম নেমে আসতে দেরি হয়নি বিশেষ।

পরের দিন সকালে স্টাডি রুমের দরজা খোলে অতীন, আর তীব্র বিস্ময়, আনন্দে ছিটকে যায়। বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ে এক সমুদ্র আবেগ, মা শুনেছেন! মা শুনেছেন!! শেষ পর্যন্ত... শেষ পর্যন্ত

ছেলের ভালোবাসার কাছে মা ধরা দিয়েছেন!!! অস্ফুটে "মা মা গো" বলে দরজা ধরে থরোথরো কাঁপতে থাকে অতীন।

সেই দেবীমূর্তির সামনে সমস্ত খাবার ছড়ানো ছিটানো। কে যে দু হাতে খাবারগুলোর খানিকটা খেয়েছে, বাকিটা স্টাডিরুমের মেঝে জুড়ে ছড়িয়েছে। দুয়েকটা দানা মূর্তির মুখেও লেগে। ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে অতীন। ডামরীও দৌড়ে এসেছিল। সেও গলবস্ত্র হয়ে নমস্কার করতে থাকে।

সেই থেকে একই জিনিস রোজ ঘটে যাচ্ছে। রোজ রাতে পূজা করে, ডামরীর রান্না ভোগ হিসেবে সেই দেবীমূর্তির সামনে সাজিয়ে, নিজে খেয়ে ঘুমোতে যায় অতীন। আজকাল বড় গাঢ় ঘুম হয় তার। নিঃসীম চেতনাহীন গাঢ় ঘুম। কখনও কখনও মগ্নচৈতন্য ঘা দিয়ে যায় কিছু খলখল হাসির শব্দ, বা কাঁচের চুড়ির শব্দ। সেই ঘুম ভাঙলে সকালে উঠে নিজের হাতে স্টাডিরুমের দরজা খোলে সে, সেই একই দৃশ্য! সমস্ত অর্ধভুক্ত, বাকিটা ঘরের মেঝেতে ছড়ানো ছিটানো। মূর্তির মুখে দুএকটা দানা লেগে থাকে। অতীনের চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে, তার প্রতি মায়ের এই নিঃসীম করুণার কথা ভেবে।

মাসখানেক বাদে একদিন সকালের দিকে অতীনের বাড়ি আসেন ভবেশবাবু। আগের দিন সন্ধ্যেবেলা থানায় গেছিলেন তিনি। পুলিশ পুষ্পর কোনও খোঁজ বা সূত্র না পেয়ে কেস ক্লোজ করে দিচ্ছে। সেটাই জানাতে মধ্য ডিসেম্বরের সেই সকালে অতীনের বাড়ি আসছিলেন উনি। পুষ্প চলে যাবার পর রোজকার আসাটা বন্ধ করে দিয়েছেন ভবেশবাবু। কিন্তু এই খবরটা না দিলেই নয়।

সদর দরজা খোলাই ছিল, বোধহয় দুধ বা খবরের কাগজ নেওয়ার জন্যে। ঢুকেই থমকে গেলেন ভবেশবাবু।

স্টাডি রুমের সামনে দাঁড়িয়ে অতীন, কোমরে প্রায় খসে পরোপরো ছোট গামছা একটা, প্রায় উলঙ্গ অতীনের দু হাত প্রণামের ভঙ্গিতে বুকের কাছে জড়ো করা, অস্ফুট "মা মা" ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পেছনে ডামরী দাঁড়িয়ে। সে কিন্তু ঠিক তার ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝেছে কেউ এসেছে ঘরে। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে শ্বাপদের ক্ষিপ্রতায় রান্নাঘরে ঢুকে যায় সে।

ভবেশবাবু মৃদুস্বরে একবার ডাকেন, "অতীন..." অতীন সাড়া দেয় না। এবার এগিয়ে এসে অতীনের কাঁধে হাত রাখেন ভবেশবাবু। অতীন ঘুরে দাঁড়ায়, গাঢ় লাল চোখ আর অদ্ভুত উজ্জ্বল দৃষ্টি, ঘ্যাসঘ্যাসে গলায় অতীন বলে "কাকু, এসেছেন? দেখুন মা আমার দেওয়া ভোগ নিয়েছেন, দেখেছেন? মা শুনেছেন আমার ডাক, কই আপনার সেই পুরুতঠাকুরকে ডাকুন, এসে দেখে যাক, ছেলের ডাকে মা সাড়া দেন কি না।"

ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা দেখে মুহূর্তের মধ্যে গা গুলিয়ে উঠলো ভবেশবাবুর। প্রায়ান্ধকার বন্ধ ঘরে ভ্যাপ্সা হাওয়ার সঙ্গে মিশেছে বাসি এঁটোকাঁটার পচা দুর্গন্ধ। এই সকালেও একটা লাল নাইট ল্যাম্প জ্বলছে, তাতে আরও ভয়াবহ দেখাচ্ছে সেই তিব্বতীয় দেবীমূর্তি। কি ভয়ানক, কি নোংরা, কি বমনোদ্রেককারী সেই দৃশ্য! ফের গা গুলিয়ে ওঠে ভবেশবাবুর। অমঙ্গলের আশঙ্কায় শিউড়ে ওঠেন তিনি।

দৃঢ় হাতে অতীনের কাঁধ ধরে বাইরে নিয়ে এসে বসান ভবেশবাবু। লক্ষ্য করেন যে, অতীন এর মধ্যেই রোগা হয়ে গেছে অনেক। গাল আরও বসে গেছে, কন্ঠার হাড় উঁচু হয়ে আছে, চোখের নিচে গাঢ় হয়ে আছে কালি, হাতের শিরা উপশিরা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

শুধু চোখ, চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে আছে। এখন গাঢ় লাল থেকে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হচ্ছে ক্রমশ। সেই দিকে তাকিয়ে চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করেন ভবেশবাবু, "এসব কবে থেকে হচ্ছে অতীন?"

উৎসাহ আর ঘোরের মধ্যে পুরো ঘটনা বলে যায় অতীন। কিচ্ছু বাদ দেয় না।

অনেক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকেন ভবেশবাবু, তারপর মাথা তুলে জিজ্ঞেস করেন, "সুবেশের দোকানটা পার্ক স্ট্রিটের ঠিক কোথায় বলতে পারবে?"

****

আজকাল মাঝেমধ্যেই বিকেলের দিকে নিমতলা শ্মশানে গিয়ে বসে থাকে অতীন। যদিও নিমতলাঘাট তার দক্ষিণ কলকাতার বাড়ি থেকে অনেকদূর। কিন্তু দক্ষিণের গড়িয়া মহাশ্মশান, সিরিটি বা ক্যাওড়াতলা কোনওটাতেই এই নিমতলা বা কাশি মিত্তিরের ঘাটের মতন গঙ্গার মিঠে হাওয়াটা পাওয়া যায় না।

আজকাল শ্মশান বড় ভালো লাগে তার। শান্ত ঠাণ্ডা জায়গা, কেউ তাকে তার এই গত মাসদুয়েকের পরিবর্তন নিয়ে জিজ্ঞাসা করে না। একটা কোণ ধরে চুপচাপ বসে থাকে সে। কয়েকটা নেড়ি, মাতাল, পাগল আর গেঁজেল নেশাড়ু ছাড়া আর কেউ থাকে না। তবে থেকে থেকেই মৃদু বলহরি হরিবোল ধ্বনি ভেসে আসে। মৃতদেহের সঙ্গে দুএকজন শোকার্ত মানুষ, এবং বাকি বেশ কিছু উল্লসিত লোকজন লরি বা শববাহী গাড়ি থেকে নামে। অন্যান্য প্রথাগত কাজ চলার মধ্যে শ্মশানের একটা কোণ দেখে কিছু ছেলেপিলে রামের বোতল আর কল্কে নিয়ে বসে পড়ে। শ্মশানের গা ঘেঁষে চা, লাড্ডু, সিগারেট আর লুচি তরকারি বিক্রির দোকানঘরগুলোতে বেড়ে ওঠে ব্যস্ততা।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, পরের দিন অমাবস্যা। প্রায় একমাস হয়ে গেছে পুষ্পদি নেই। ভবেশকাকুও শেষ এসেছিলেন দিন পনেরো আগে। তারপর তাঁরও আর পাত্তা নেই। গত পনেরো দিনে শরীর আরও খারাপ হয়েছে অতীনের। অফিসের লোকজন অবধি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে শরীরের এই অবস্থা দেখে। দিন পাঁচেক আগে রিজিওনাল ম্যানেজার সাহেব তো প্রায় জোর করেই বেলভিউতে পাঠাচ্ছিলেন। এইসব নামজাদা হাসপাতালের সঙ্গে কম্পানির বোঝাপড়া আছে, পয়সা লাগবে না, কম্পানির আই কার্ড নিয়ে ভর্তি হলেই হলো। বিল মেডিক্লেইম কম্পানি মেটাবে।

কিন্তু না। অতীন জানে যে সে সুস্থ। কোনওগতিকে সেদিন পালিয়ে এসেছে সে, তারপর থেকে টানা পাঁচদিনের ছুটিতে।

সবই ঠিক আছে। রোজ রোজ মা ভোগ খেয়ে যাচ্ছেন, অর্ধভুক্ত খাবার সারা স্টাডি রুম জুড়ে ছড়িয়ে থাকে। কিন্তু একটা জিনিস অতীনের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে পুষ্পদির যাওয়ার পর থেকেই।

খাবার।

ডামরীই রান্না করে। নিশ্চয়ই সে রান্না খুব ভালো, নইলে মা সেই ভোগ স্বীকার করলেন কেন? কই, পুষ্পদির রান্না তো মা কোনওদিনই ভোগ হিসেবে নেননি?

কিন্তু রান্নাটা কোনও এক অদ্ভুত কারণে অতীনের পোষাচ্ছে না। খাবারে সবসময় সে একটা কটু গন্ধ পায়। হয়তো কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই, সবই ঠিক আছে, কিন্তু খাবার মুখে দিলেই অজ্ঞাত কারণে গা গুলিয়ে ওঠে তার। মনে হয় জন্মজন্মান্তরের ভাত নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে সব কিছু উঠে আসবে।

আজকাল তাই খাওয়াদাওয়া খুব কমে গেছে তার। যেটুকু পারে, ওই একটু অমলেট আর সিদ্ধ ভাত খেয়ে বেরিয়ে আসে সে। ডামরী গজগজ করে খুব। এখন এত সব রান্না নিয়ে কি করবে সে?

আজকাল তো অতীনের বাড়ির আশেপাশে কুকুর বিড়ালও আসে না। এমন কি বাড়ির ওপর দিয়ে কাক অবধি ওড়ে না। এটাও লক্ষ্য করেছে অতীন।

আজও উদাসী মুখে একটা সিমেন্টের বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে বসে ছিল অতীন। খুব খিদে পেয়েছে তার। উঠে গিয়ে কাছের দোকানে গেছিলো কিছু পাওয়া যায় কি না দেখতে। দোকানদার খুব কাঁচুমাচু মুখে জানিয়েছে আজ কাস্টমার বহোত জ্যাদা। একটা রুটি আপাতত আছে আর দুটো জিলাবি । বাবু আপাতত এই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করুন। আধা ঘন্টা বাদে সে দুটো গরমাগরম রুটি দিয়ে শাম কা নাস্তার ব্যবস্থা করে দেবে।

রুটিটা তুলে হাতে নিয়েছে সবে, পাশ থেকে একটা আওয়াজ পেয়ে থমকে যায় সে, "ইয়ে, একা খাবেন নাকি? হাফ হাফ করে খেলে হতো না? আমাকেও নগিন্দর বলেছে আধ ঘন্টাবাদে রোটি পাক্কা মিলেগা... হ্যা হ্যা হ্যা...তখনই না হয় শোধ দিয়ে দেবো, অ্যাঁ? এমনি অবশ্য বলি না কাউকে তেমন। কিন্তু আজ মশাই ক্ষিদেটা মোটে সহ্য হচ্ছে না।"

পাশের দিকে তাকায় অতীন। এই প্রায় অন্ধকারের মধ্যে লোকটা কখন এসে পাশে বসেছে সেটা খেয়ালই করেনি অতীন। দেখে অবশ্য ভিখিরি বা চোর ছ্যাঁচড় মনে হয় না। ফরসা, বেঁটেখাটো একটা লোক, সাধারণ একটা হাফ শার্ট আর ট্রাউজার্স পরনে। চোখ দুটো আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল, তাতে যেন কৌতুক খেলা করছে।

অতীনের একটু মায়া হলো। হাতের রুটিটা ছিঁড়ে দুভাগ করলো সে, তারপর ডানহাতের ভাগটা তুলে দেয় লোকটার হাতে, জিলিপির ঠোঙাটা এগিয়ে দেয়।

লোকটা রুটির টুকরোটা নিয়ে খানিকক্ষণ অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইলো অতীনের দিকে, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "ডানহাতের বড় টুকরোটাই দিলেন যে? বাঁহাতের ছোটটাও তো দিতে পারতেন?"

অতীন একটু অপ্রস্তুত হয়, "অত কিছু মনে করে দিইনি। আপনি বললেন খিদে পেয়েছে...আর নগিন্দর তো একটু পর বানিয়ে দিচ্ছেই".....

লোকটা রুটির টুকরোটা নিয়ে মাথায় ঠেকায়, তারপর স্পষ্ট সংস্কৃতে বলে, "শ্রদ্ধয়া দেয়ম, শ্রীয়া দেয়ম", বলেই রুটিটা মুখে পুরে পরম তৃপ্তির সঙ্গে চিবোতে থাকে।

কি জানি, লোকটাকে বেশ ভালো লেগে যায় অতীনের, নিজের রুটির টুকরোটা জিলিপি দিয়ে চিবোতে চিবোতে বলে, "দাদার বাড়ি কোথায়?"

লোকটা নিমীলিত চোখে বলে, "অনেক দূর দাদা, নবদ্বীপ, নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট।"

"হুমম, তা বেশ সংস্কৃত জানেন দেখছি। কি করা হয়?"

"ওই আর কি দাদা, ছাত্র ঠ্যাঙানো আর পুজোআচ্চা, পারিবারিক ব্যবসাই বলতে পারেন, হে হে..."

"ও, আপনি টিচার? আরে আগে বলবেন তো। দাঁড়ান দাঁড়ান, নগিন্দরকে বলে দেখি...আমার বাবাও প্রফেসর ছিলেন... "

"বাহ, ভালো ভালো। সমস্ত দানের মধ্যে শিক্ষাদান হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম দান।"

"তা দাদা হঠাৎ নবদ্বীপ ছেড়ে কলকাতার শ্মশানে?"

"আর দাদা, বলবেন না, একটা বই লিখেছি, বুঝলেন, সেই নিয়ে পাবলিশারের সঙ্গে কথা বলবো বলেই কলেজস্ট্রীটে আসা। তা কাজ হয়ে গেলো, ভাবলাম একবার ঘুরেই যাই। শ্মশান অতি বিশুদ্ধ স্থান, চিত্ত পরিষ্কার হয়...."

"আরে দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনি বইও লেখেন না কি? আরে বাহ। তা কিসের বই?"

"ওই, পুজোপাঠের বই দাদা। এদিক ওদিক থেকে বিভিন্ন পুজো প্রথা এক জায়গায় নিয়ে একটা সংকলন মতো করেছি। তেমন বিশেষ কিছু নয়..."

"বাহ বাহ, তা আপনি পূজারী মানুষ, তন্ত্র মন্ত্র এসব দিকেও ইন্টারেস্ট আছে নিশ্চয়ই", বহুদিন বাদে কারও সঙ্গে কথা বলতে পেরে অতীনের সত্যিই খুব ভালো লাগছিল।

" তন্ত্রমন্ত্র তেমন ইম্পর্ট্যান্ট কিছু না দাদা। মানুষকে ভালোবাসার থেকে বড় তন্ত্র আর কিছু হয় না। এই যে আপনি একটা মাত্র রুটি দুইভাগ করে বড়ভাগটা ডান হাতে ভালোবেসে আমার হাতে তুলে দিলেন, এর চেয়ে বড় তন্ত্রমন্ত্র কিছু আছে না কি? বুঝলেন, অনেক পুজোপাঠ করে এই সার বুঝেছি, ভালোবাসা হলো সবচেয়ে বড় তন্ত্র, সবচেয়ে বড় যাদু"।

অতীন চুপ করে রইলো। ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকান অতীনের দিকে, তারপর বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়েই থাকেন। বাপরে, সে কি দৃষ্টি, অতীন সিঁটিয়ে যায়। তারপর আপন মনে বলেন, "তিনি ত্রিগুণাতীতা, রাজরাজেশ্বরী। অপশক্তির সাধ্য কি তাঁর সন্তানের ক্ষতি করে?" বলে পকেট থেকে একটা কি বার করলেন।

অতীন দেখলো একটা লালসুতোর মালা, শুধু একটি রুদ্রাক্ষ আকারের স্ফটিক আছে তাতে, আর কিচ্ছু নেই। অতীন কিছু বলবার আগেই ভদ্রলোক একটু ঝুঁকে মালাটা পরিয়ে দেন অতীনকে, তারপর হাসিমুখে বলেন, "নিন দাদা, একটা জিনিস দিয়ে গেলাম। কক্ষনো গলা থেকে খুলবেন না।

যখন এর কাজ শেষ হবে, আপনা থেকেই আমার কাছে চলে আসবে। আহা, ব্যস্ত হতে হবে না। নিরন্ন ক্ষুধার্তকে যিনি নির্দ্বিধায় নিজের গ্রাস তুলে দিতে পারেন, মহামায়া তাঁকে রক্ষা করুন।"

অতীন প্রথমে বিরক্ত ও পরে হতচকিত হয়ে যায়, তারপর বলে ওঠে, "আরে, কথা নেই বার্তা নেই, ও দাদা কি পরিয়ে দিয়ে গেলেন? আর এ জিনিষ আমি পরবোই বা কেন? আচ্ছা লোক তো আপনি।"

ভদ্রলোক বোধহয় একটু লজ্জাই পেলেন, "আহা, রাখুন না মশাই। ক্ষতি তো কিছু নেই। বিপদে আপদে মানুষই তো মানুষের কাজে আসে, না কি?"

"বিপদ? কিসের বিপদ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!"

"বুঝতে হবে না। শুনুন, ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাত যাই ঘটুক, পৃথিবী এদিক থেকে ওদিক হয়ে যাক, আপনি এই মালা খুলবেন না। যদি বাঁচতে চান, এই আপনার প্রাণভোমরা। এটি কাছ-ছাড়া করবেন না। যা বললাম, মনে থাকে যেন।"

শুনে চমকে গেলো অতীন। ভদ্রলোক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। কাঁপা গলায় অতীন জিজ্ঞেস করে, "আপনি কে দাদা? নামটা একটু বলবেন?"

ভদ্রলোক হেসে ফেলেন, "নাম জেনে কি করবেন? আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আর নেই বললেই চলে। তবুও যখন জানতে চেয়েছেন তখন তো বলতেই হয়, আমার নাম হচ্ছে কে এন মৈত্র, বাবা মহেশ মৈত্র। নবদ্বীপের মৈত্র বংশের ছেলে আমি"।

বলে একটু চুপ করেন। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এসেছে তখন, সেই অন্ধকারে ভদ্রলোক যেন মিলিয়ে যেতে থাকেন, সেখান থেকেই তাঁর গলার স্বর ভেসে আসে, "অবশ্য যে বইটা লিখেছি, তাতে আপনি দেখবেন অন্য উপাধি লেখা আছে। লোকে আমাকে সেই উপাধিতেই বেশি চেনে, আগমবাগীশ। আমার পুরো নাম কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ"।

****

"ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্ ।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।।
সদ্যশছিন্নশিরঃ খড়গবামাধোর্দ্ধক রাম্বুজাম্ ।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোদ্ধার্ধপাণিকাম্।।
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্ ।
কন্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধিরচর্চিতাম্ ।।
কর্নাবতংসতানীতশ বযুগ্মভয়ানকাম্ ।
ঘোরদ্রংষ্টাং করালস্যাং পীণোন্নতপয়োধরাং।।"

একমনে পুজো করছিলেন দ্বিজোত্তম মিশ্র। প্রায় পাঁচশো বছরের পুরোনো প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তি ওঁর বাড়িতে। মায়ের সান্ধ্যকালীন নিত্যপূজাটিই উনি করে থাকেন।

দিনের বাকি কাজ অবশ্য ওঁর পুত্রবধূই করেন। ছেলে ব্যাঙ্কের চাকুরে, দরকারে সেও হাত লাগায়। আর এখন তো সারাদিনের জন্যই মা নিজের পূজার দায়িত্ব ওঁর কাঁধে তুলে দিলেন। জমিদারবাড়ির কর্তব্যকর্ম তো ফুরোলো। অবশ্য ওঁর নিজের বয়েসই কি খুব কম হলো? সামনের জ্যৈষ্ঠমাসে আশিতে পা দেবেন উনি। মা নিজেই তাঁর সন্তানের ভার লাঘব করছেন ধীরেধীরে।

পূজা শেষ হলে সাষ্টাঙ্গে মা'কে প্রণাম করেন উনি। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়েই, থমকে যান।

ঠিক ঠাকুরঘরের সামনেই দুইজন ভক্তি সহকারে বুকের কাছে হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছেন। একজন বয়স্ক, আরেকজন তরুণ। এদের পেছনে ওঁর পুত্রবধূ, তিনি মৃদুস্বরে জানালেন, "বাবা, এনারা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কলকাতা থেকে, বলছেন খুব জরুরি দরকার। আপনি পুজো করতে ব্যস্ত ছিলেন বলে আর আপনাকে বিরক্ত করিনি।"

দুইজনের মধ্যে যিনি বয়স্ক, তিনি দুহাত তুলে একটু মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করেন, "নমস্কার ঠাকুর মশাই। আমার নাম ভবেশ ভট্টাচার্য। কলকাতা থেকে আসছি। এককালে কলেজে ইতিহাস পড়াতাম, এখন রিটায়ার্ড। আর আমার সঙ্গে এই ছেলেটির নাম সুবেশ আগরওয়াল। পার্ক স্ট্রিটে ওর একটা দোকান আছে পুরোনো জিনিসপত্রের। আপনি বোধহয় আগে দেখেছেন ওকে।"

সুবেশ প্রায় কোমর অবধি ঝুঁকে প্রণাম জানায়, জায়গা পেলে বোধহয় শুয়েই পড়তো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে জানায়, "সেই মাস দুয়েক আগে এই জমিদারবাড়ির পুরোনো জিনিসপাতি কিনে নিয়ে গেছিলাম, আপনি একটা মূর্তি দিলেন ফ্রি অফ কস্ট, মনে নেই?"

দ্বিজোত্তম মিশ্রের মুখে বিস্ময়, ভয়, আশ্চর্য সবকটি ভাবের ছায়া খেলে যায় একসঙ্গে, তারপর স্মিতহাস্যে বলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে বৈ কি, বিলক্ষণ মনে আছে। বলুন ভাই, কি সেবা করতে পারি আপনাদের" বলেই পুত্রবধূকে বলেন, "মা , আমাদের সবার জন্যে এককাপ করে চা এনে দাও না", শুনেই সেই মহিলা দ্রুতপায়ে ভেতরে চলে যান।

"এইখানেই বসি ঠাকুর মশাই? আহা মায়ের মুখটি বড় সুন্দর। জগজ্জননী মহামায়া, মা মা গো", ফের যুক্ত করে প্রণাম করেন ভবেশ ভট্টাচার্য।

প্রীত হন দ্বিজোত্তম। মন্দিরের চাতালেই পদ্মাসনে বসেন। মুণ্ডিতমস্তক, ঋজু পাকানো দেহ, চোখে প্রগাঢ় প্রশান্তি।

বলেন, "এই মূর্তি বিশেষভাবে প্রাপ্ত, বুঝলেন। আমাদের এক পূর্বপুরুষ বহুভাষাবিদ ছিলেন। মল্লভূমের মল্লরাজাদের নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছেন, ও আপনি তো ইতিহাসের অধ্যাপক। তা আমদের এই পূর্বপুরুষ, নাম দনুজদমন মিশ্র, রাজা চন্দ্র মল্ল'র কাছে চাকরি করতেন। তাঁর কাজ ছিল মল্লভূমবাসী সাঁওতাল আর মুণ্ডাদের সঙ্গে রাজার যোগাযোগ রক্ষা করা। একবার ভুল বোঝাবুঝির কারণে মহা অনর্থ উপস্থিত হয়, রাজা আদিবাসীদের উৎখাত করার আদেশ দেন। চন্দ্র মল্ল প্রবল প্রতাপশালী পুরুষ ছিলেন। আমার পূর্বপুরুষ রাজাকে অনেক বুঝিয়ে, সুকৌশলে রাজার ক্রোধ প্রশমিত করেন। কৃতজ্ঞচিত্ত মুণ্ডাসর্দার তাঁদের পূজিত দেবীকে আমাদের সেই পূর্বপুরুষকে উপহার দেন। সেই থেকে কষ্টিপাথরের এই মূর্তি আমাদের গৃহদেবী।"

সুবেশের চোখ দেখে বোঝাই যাচ্ছিলো, সে ভক্তিভরে প্রণাম করবে, না এই অমূল্য মূর্তিটির দাম আন্দাজ করবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। এক চোখে শ্রদ্ধা, আরেক চোখে প্রফিট!

ততক্ষণে চা এসে গেছিলো। তাতে চুমুক দিতে দিতে ভবেশবাবু সরাসরি আসল প্রসঙ্গে চলে আসেন, "ঠাকুরমশাই, আপনি একটি দেবীমূর্তি আমাদের এই সুবেশকে এমনিই দিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মূর্তিটির ব্যাপারেই কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল।"

দ্বিজোত্তম চোখের পলক অবধি ফেললেন না বটে, কিন্তু মুহূর্তের জন্য, চকিতে সারা শরীরটা একবার কাঠ হয়ে উঠলো।

মৃদু হাসলেন ভবেশবাবু। ইনভলান্টারি ডিফেন্স মেকানিজম। দেয়ার মাস্ট বি সামথিং রং, টেরিবলি রং।

দ্বিজোত্তম গলা খাঁকারি দিয়ে বেশ স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, "সে তো মাস দুয়েক আগের কথা। মূর্তি একটা ছিল বটে, দিয়ে দিয়েছি। এমন কি তার দাম অবধি নিইনি। তা সেই নিয়ে এত প্রশ্ন কিসের? আমার তো আর কোনও দায় নেই।"

"দায়ের কথা আসছে কোথা থেকে ঠাকুরমশাই? আমরা তো আপনাকে কোনও দোষারোপ করিনি। আপনার কি মনে হয় এই মূর্তি থেকে আপনার কি কোনও দায়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে?"

পলকে সাদা হয়ে যায় দ্বিজোত্তম মিশ্রের চোখমুখ, তারপর রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, "আপনারা কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন? আপনি জানেন আমি কে? আমরা ঊর্ধ্বতন বিশপুরুষের তান্ত্রিক পরিবার। আপনি জানেন আমি কি করতে পারি আর কি করতে না পারি? আপনারা ভেবেছেন কি? আমি কি আপনাদের চাকর যে কৈফিয়ত দিতে হবে আপনাদের?"

পলকে দ্বিজোত্তম মিশ্রের দুই পা ধরে ফেলেন ভবেশবাবু। সুবেশ এতক্ষণ কাঠ হয়ে ছিল, এবার সেও কিছু একটা খুঁজতে থাকে ধরার জন্যে। অবশেষে কিছু না পেয়ে সোজা উপুড় হয়েই শুয়ে পড়ে।

ভবেশবাবুর গলা কেঁপে যায়, "ঠাকুর আমি বিয়ে করিনি, আমার ত্রিসংসারে কেউ নেই। ছোটবেলার বন্ধুর এক সন্তান, তাকেই নিজের সন্তান বলে জেনেছি। তার আজ বড় বিপদ ঠাকুর। এই মূর্তি সে ঘরে নিয়ে গিয়ে ইচ্ছেমত ছেলেখেলা করেছে। ফলে তার জীবনে আজ ঘোর কালরাত্রি নেমে এসেছে ঠাকুর, তার জীবন বিপন্ন। আমিও সদ্বংশের ছেলে, জীবনে কোনওদিন মিথ্যে বলিনি, লোক ঠকাইনি। কিন্তু ওই ছেলেটি আমার নিজের ঠাকুর। ওকে বাঁচান, মা মহামায়া আপনাকে আশির্বাদ করবেন।"

খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকেন দ্বিজোত্তম মিশ্র। তারপর যখন মাথা তোলেন তখন ওঁর মুখের রেখা অনেক কোমল হয়ে এসেছে। মন্দিরের সামনে চাতাল থেকে আকাশ দেখা যায়। মধ্য ডিসেম্বরের সন্ধ্যা, আকাশ কালচে নীল। স্নিগ্ধ সন্ধ্যাতারাটি ফুটে উঠেছে পশ্চিমে। সেদিকে তাকিয়ে অতীতমগ্ন হন বিখ্যাত বামাচারী তান্ত্রিক দ্বিজোত্তম মিশ্র।

"আপনাদের যা বলবো সে সব কাহিনী শুধু মৌখিক ভাবেই আমাদের বংশপরম্পরায় চলে আসছে, এর কোথাও কোনও লিখিত প্রমাণ নেই।

"আমাদের পূর্বপুরুষ দনুজদমন মিশ্র মুণ্ডাসর্দারের দেওয়া কালীমূর্তি পেয়ে রাজা চন্দ্র মল্ল'র কাজ ছেড়ে পালিয়ে আসেন এই এলাকায়। তখন এলাকার জমিদার ছিলেন বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী। তিনিও প্রবলপ্রতাপ জমিদার ছিলেন। বাংলাদেশে তখন হুসেন শাহের জমানা। এদিকে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ভাবধারায় গোটা বাংলা বিহার উড়িষ্যা ডুবুডুবু। কিন্তু বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী ছিলেন ঘোর শাক্ত। তাঁর এলাকায় বৈষ্ণবরা মাথাই গলাতে পারেনি তেমন।

"বিশ্বেশ্বরের এক ভাই ছিলেন, সহস্রাক্ষ চক্রবর্তী। ইনি ব্রাহ্মণ হলেও বিভিন্ন ভেষজ ও প্রাণীজ বিষ সম্পর্কে আশ্চর্য জ্ঞান ছিল। লোকমুখে প্রবাদ, রাজগোখরো অবধি নাকি সহস্রাক্ষ চক্রবর্তীর নাম শুনে মাথা নিচু করে পথ ছেড়ে দিতো।

"বছর তিরিশেক বয়সে সহস্রাক্ষ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যান। বিশ্বেশ্বর বয়সে অনেক ছোট গুণী ভাইটিকে নিজের সন্তানসম স্নেহ করতেন। তিনি পাগলের মতন খোঁজ করেন, কিন্তু সহস্রাক্ষের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না।

"ঠিক বছর কুড়ি বাদে সহস্রাক্ষ আবার ফিরে আসেন এই জমিদারিতে। বিশ্বেশ্বর তখন প্রায় পঁয়ষট্টি বছরের প্রৌঢ়, তাঁর নিজের সন্তানই প্রায় চল্লিশ বছরের তখন। তাও তিনি সহস্রাক্ষকে জমিদারির ভার নিতে অনুরোধ করেন।

"কিন্তু যে সহস্রাক্ষ গেছিলেন, তিনি যুবক বিষবৈদ্য। যিনি ফিরেছেন, তিনি ঘোর বামাচারী তান্ত্রিক। তিনি রক্তাম্বর ছাড়া কিছু পরেন না, স্বপাক ছাড়া আহার করেন না, সারা মুখে দাড়িগোঁফ আর জটাজুট। তিনি শুধু বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নন, তিব্বতীয় বজ্রযানতন্ত্রও তাঁর করায়ত্ত তখন। জমিদারি নেওয়া তো দূরস্থান, এসেই কি একটা যজ্ঞ করে ঘোষণা করলেন যে এরপর থেকে চক্রবর্তী পরিবারে যেই কখনও কোনও ভ্রাতৃবিরোধ শুরু করবে, তার সর্বনাশ হবে। পুত্রসম ভ্রাতুষ্পুত্রকে কি একটা যজ্ঞসম্ভব মাদুলি বানিয়ে দিলেন, যাতে তার ও তার বংশজদের সম্পত্তিলাভ নিষ্কণ্টক ও নির্বিঘ্ন হয়। যেন কোনও ভ্রাতৃদ্রোহের ছায়া এ বাড়ির আনাচেকানাচে না পড়ে।"

এতটা বলে দম নিলেন দ্বিজোত্তম। পরের রাউণ্ডের চায়ের আদেশ দেন, তারপর শুকনো ঠোঁট চেটে বলতে থাকেন,

"খবরে প্রকাশ পায়, যে সহস্রাক্ষ পালিয়ে প্রথমে নেপাল ও তার পর তিব্বত গেছিলেন। নেপালের তরাই অঞ্চলে এক তান্ত্রিকের কাছে বামাচারে দীক্ষা নেন। বছর দশেক সেখানে থেকেচলে যান তিব্বত। সেখানে তখন বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের গৌরবময় অধ্যায় চলছে। সহস্রাক্ষ এক বিখ্যাত তান্ত্রিক গুরু জুটিয়ে বজ্রযান তন্ত্রসাধনায় মগ্ন হন। অত্যন্ত মেধাবী হওয়ার দরুন খুব তাড়াতাড়ি সহস্রাক্ষ বজ্রযানের সবকটি মার্গ অতিক্রম করতে পারেন। সঙ্গে সহজাত বিষবৈদ্যগিরি তো চলছিলই।

"তিব্বতে তখন ভয়ানক অরাজক সময়। গের উপজাতীয় শাসক রিন্সপাংস্পা রাজবংশের শেষের শুরু। রাজধানী শিগাৎসের গভর্নর কর্মা সেন্তেন বিদ্রোহী হয়েছেন। তিনিই গোপনে সহস্রাক্ষের গুরুকে ডেকে পাঠান, তন্ত্রশক্তির সাহায্যে জয়ী হওয়ার জন্যে।

"সেই তিব্বতীয় ধর্মগুরু নিজে গেলেন না, পাঠালেন সহস্রাক্ষকে। সহস্রাক্ষ গিয়ে দেখলেন অবস্থা খুবই সঙ্গীন। ইতিমধ্যেই কর্মা সেন্তেনের একমাত্র মেয়ে শত্রুপক্ষের কূটচালে মরোমরো প্রায়। সহস্রাক্ষ আবিষ্কার করলেন যে মেয়েটি ধীর বিষক্রিয়ার শিকার। তাঁর সতর্ক বিষনিবারণী বিদ্যার দৌলতে সামন্তকন্যার দ্রুত রোগমুক্তি ঘটে।

"কিন্তু এতেই ঝামেলা শেষ হলো না। যারা চাইছিল কন্যাকে মেরে কর্মা সেন্তেনকে দুর্বল করবে, তারা এবার সহস্রাক্ষের পিছনে পড়লো। তখন সহস্রাক্ষ এই মূর্তিটি বানান।

"আপনারা যদি খুব ভালো করে মূর্তিটাকে দেখতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন যে আদতে এটি হিন্দুমূর্তি, সহস্রাক্ষের কাছে মৌখিক বর্ণনা শুনে এক তিব্বতীয় মূর্তিকার বানিয়েছে বলে দেখলে তিব্বতীয় মনে হয়। এই মূর্তি তৈরি হবার পর এক অমাবস্যার রাত্রে, পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণও ছিল সেদিন, সহস্রাক্ষ নিজে এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন।"

এতটুকু বলে সেই বৃদ্ধ থামলেন, তারপর চোখ সরু করে জিজ্ঞাসা করলেন, "তন্ত্রের অভিচার ক্রিয়া নিয়ে কোনও ধারণা আছে শিক্ষক মশাই?"

গলা খাঁকারি দেন ভবেশবাবু, তারপর বলেন, "জানি বৈ কি। মারণ, উচাটন, স্তম্ভন, ইত্যাদি। "

খানিকক্ষণ চুপ থাকেন দ্বিজোত্তম, তারপর আরও ধীর গলায় বলতে থাকেন, "হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্র মিলিয়ে যা যা অভিচারক্রিয়া শিখেছিলেন সহস্রাক্ষ, তাই দিয়ে তিলে তিলে মূর্তির বীজক্রিয়া তৈরি করেছিলেন। ফল ফলতে বেশি সময় নেয়নি, শাসক রিন্সপাংস্পা রাজবংশ সবংশে ধ্বংস হয়। কর্মা সেন্তেন সমগ্র তিব্বতের রাজা হন।

"এর পর কর্মা সেন্তেন সহস্রাক্ষের ওপর চাপ দিতে থাকেন মূর্তিসহ তাঁর কাছে থেকে যেতে। রাজগুরুর পদ নিতেও অনুরোধ করেন। কিন্তু বিধির লীলা বোঝা বড় দায়। উড়ে বেড়ানো পাখিকে কি আর সোনার খাঁচায় বন্দী রাখা যায়? আর সহস্রাক্ষ এও জানতেন যে ওই পৈশাচিক শক্তির আকরস্বরূপ মূর্তিটি আর কোনও নিম্নগোত্রীয় তান্ত্রিকের হাতে গেলে কি প্রলয়ঘটতে পারে।

"ফলে এক ঝড়জলের রাতে অন্ধকারে মূর্তিটি নিয়ে সহস্রাক্ষ পালিয়ে যান। না উনি আর গুরুর কাছে যাননি, তাহলে মূর্তিটা বাঁচানো যেত না। উনি সোজা ফিরে আসেন নিজের বাড়ি, এই বামুনগাছিতে।

"এখানে এসে মহা সমারোহে সেই মূর্তিটি নিজের জমিদারবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন। আর তার নিত্য তান্ত্রিকপূজার ভার পড়ে আমাদের পূর্বপুরুষ, দনুজদমনের হাতে।

"দনুজদমন কালীভক্ত ছিলেন, তান্ত্রিক ছিলেন না। সহস্রাক্ষ তাঁকে নিজের হাতে বামাচারী তন্ত্রসাধনা শেখান। গুরু উপযুক্ত শিষ্যই পেয়েছিলেন বটে। কোনও এক তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তিনি দনুজদমনকে নিয়ে রক্তপ্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন যে, যতদিন এই জমিদারবাড়ি চক্রবর্তী বংশের নামে থাকবে, ততদিন দনুজদমনের বংশধররা সেই সহস্রাক্ষের আনা মূর্তির নিত্য তন্ত্রসেবা করে যাবে। সেই মূর্তির জোরে ব্রিটিশ শাসন, মন্বন্তর, দু'খানা বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ কোনও কিছুর আঁচই এ বাড়িতে পড়েনি।

আর সেই থেকে আমরা, মিশ্র পরিবারের প্রতিটি সন্তান তন্ত্রজ্ঞ এবং চক্রবর্তী পরিবারে বংশগত পুরোহিত।

"সহস্রাক্ষ কিন্তু এরপরেও সংসারে থাকেননি। দাদা বিশ্বেশ্বর মারা যান বছর দুয়েক বাদে। যেদিন শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হয়, সেদিনই উনি বিশ্বেশ্বরের ছেলে বিশ্বনাথের নামে বিশেষ হোমযজ্ঞ করেন, বিশ্বনাথ তখন বিয়াল্লিশ বছরের নবযুবা।

"আর সেইদিন রাতে তিনি দ্বিতীয় ও শেষবারের মতন গৃহত্যাগ করেন। এর পরে তাঁর খোঁজ আর কেউ পায় নি!"

"এটাই কি সেই স্ট্যাচু যেটা আমাকে দিয়েছিলেন?" তড়বড় করে বলে ওঠে সুবেশ।

ম্লান হাসেন সেই বৃদ্ধ পুরোহত, "হ্যাঁ বাবা। সেই রকমই নির্দেশ ছিল দনুজদমনের, নিজেদের বংশধরদের প্রতি। যেদিন চক্রবর্তী বংশের উত্তরাধিকারী এই প্রাসাদকে আর নিজেদের বাড়ি বলবে না, সেইদিনই যেন আমরা যেনতেনপ্রকারেণ এই মূর্তির মায়া ত্যাগ করি।"

"কিন্তু কেন ঠাকুর? কে এই দেবী? এত তন্ত্রবিদ্যা প্রয়োজন কেন? ইনি এত ভয়ংকরীই বা কেন? কে ইনি?"

ফের খানিকক্ষণ চুপ থাকেন দ্বিজোত্তম, তারপর বলেন, "এটি আসলে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি মন্ত্রসিদ্ধ দশমহাবিদ্যা মূর্তি। আগেই বলেছি আপনারা যদি খুব ভালো করে মূর্তিটাকে দেখতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন যে আদতে এটি হিন্দুমূর্তি, এবং ইনি দশমহাবিদ্যার কোনও দেবী।"

"কে ইনি? কোন দেবীর মূর্তি, ঠাকুর??" প্রায় ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করেন ভবেশ ভট্টাচার্য।

একটা আবছা আতঙ্কের ছায়া খেলে গেলো চক্রবর্তী বাড়ির শেষ পুরোহিত দ্বিজোত্তমের চেহারাতে। তিনিও মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলেন, "ইনি যে সে দেবী নন, ইনি দশমহাবিদ্যার নবম মহাবিদ্যা, ভয়ঙ্করী দেবী মাতঙ্গী।"

****

মেট্রোয় করে বাড়ি আসার সময় অতীনের একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিলো। যেন মাথাটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেছে, কি যেন একটা ছিল, এখন নেই। কিসের যেন কি একটা মগজে চেপে ছিল, আস্তে আস্তে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে উড়ে যাচ্ছে, যেন সেই উড়ে যাওয়াটাও টের পাচ্ছে অতীন। মাথার মধ্যে একটা ঠাণ্ডা শিরশিরানি ভাব, শীতের রাত্রে কর্পূর দেওয়া জলে স্নান করার মতন। মস্তিষ্কের পরত কেটে কে যেন ভাবনাগুলোকে আরও সতেজ, সুতীক্ষ্ণ করে তুলছে।

বাড়ির একটা চাবি ওর কাছে থাকেই। রাতে বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্বস্তিকর চাপা গন্ধ যেন পাঁচিলের মতন সামনে দাঁড়ালো অতীনের। যেন সে পাঁচিল গায়ের জোরে ভেঙে অতীনকে ঢুকতে হবে।

ঠিক এই মুহূর্তে অতীন খেয়াল করলো, তার বুকের কাছে থাকা রুদ্রাক্ষটা ঈষৎ গরম হয়ে উঠেছে। তাতে বুকে ছ্যাঁকা লাগছে না বটে, কিন্তু গরম হওয়াটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অতীন দরজার পাশে, শু্য র‍্যাকের সামনে চপ্পল খোলে, তারপর জামা খুলতে খুলতেই নিজেরই টকপচা ঘামের গন্ধে ওয়াক তোলে - ইশ, কদ্দিন কাচা হয়নি জামাটা? তারপর ট্রাউজারের দিকে নজর যায়, নোংরা ধুলোপড়া, ঘামনুনের সাদা দাগওয়ালা এই ট্রাউজার্সটা পরে ও ঘুরছে?

হঠাৎ মাথা গরম হয়ে যায় অতীনের, বাড়িতে কাজের লোক রেখেও এই অবস্থা কেন? চেঁচিয়ে ডাকে, "ডামরী, ডামরী, গেলে কোথায়?"

রান্নাঘর থেকেই ডামরী ছুটে আসে, এবং অতীনের দিকে চোখ পড়তেই সবেগে ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

এইখানটায় মুহূর্তের এক ক্ষুদ্র খণ্ডাংশের জন্যে অতীন যা দেখলো, সেটা হয়তো সে কোনওদিনই প্রমাণ করতে পারবে না। কিন্তু দেখাটাকে সে অস্বীকারও করতে পারবে না।

মুহূর্তের সেই খণ্ডাংশে অতীন দেখে হঠাৎ যেন ডামরীর সমস্ত মুখ বীভৎস কালো হয়ে গেলো, চোখ দুটো লাল আর বড় বড়, মাথার চুল সাপের মতন উড়ছে, লাল ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁকা, তীক্ষ্ণ যে দুটি দাঁত বিদ্যুতের মতন ঝিকিয়ে উঠলো, ও দুটি কি শ্বদন্ত?

মুহূর্তের খণ্ডাংশ, তার মধ্যেই অতীনের বুকের সেই রূদ্রাক্ষাকার স্ফটিক যেন দপ করে জ্বলে উঠলো।

স্পর্ধার বিরুদ্ধে স্পর্ধার মতন!

ওই, মুহূর্তের খণ্ডাংশ মাত্রই। তারপরেই ডামরী একগাল হেসে বললো, "বলো দাদাবাবু, ডাকলে?"

অতীন ভ্রু কুঁচকে বলে, "জামাকাপড় এত নোংরা, তুমি কি এসব দেখো না? কাল যেন পরিষ্কার জামাকাপড় পাই। এসব কাল সকালে উঠেই কেচে ফেলবে। নোংরা কাপড় আমি পছন্দ করি না।"

ডামরীর ঠোঁট হাসে, চোখ হাসে না!

অতীন স্নান করে, গীজার চালিয়ে। গলার অদ্ভুত স্ফটিকটাকে পরীক্ষানিরীক্ষা করে। বিশেষ কিছুই খুঁজে পায় না। কাঁচের তৈরি স্ফটিকখণ্ড, একটু ভারি এই যা!

স্নান করে অতীন রোজকারমত রক্তবস্ত্র ধারণ করে। তারপর স্টাডি রুমের দরজা খুলে দাঁড়ায়।

বদ্ধ স্টাডি রুম, জানলাগুলো গত দেড়মাস ধরেই বন্ধ। একটা চাপা এঁটোকাঁটার গন্ধ ঘরের বাতাস আরও ভারি করে তুলেছে। রাস্তার দিকের জানালার ফাঁক দিয়ে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো চুঁইয়ে আসছে। অতীন স্পষ্ট দেখলো সেই দেবীমূর্তির মাথার কাছে একটা বিন্দুবৎ লাল আলো জ্বলে উঠলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে অতীন লক্ষ্য করলো যে ওর বুকের স্ফটিকনির্মিত রুদ্রাক্ষটি মৃদু নীল আলো জ্বালাতে শুরু করেছে।

হঠাৎ ঘরের মধ্যেই হাওয়ায় একটা চাপা ঘূর্ণি অনুভব করলো অতীন। মেঝে থেকে দুটো মুখোমুখি হাওয়ার স্রোত যেন লড়াই করতে করতে ওপরে উঠছে। খুবই হালকা করে দুটো সাপের তীব্র শিসের শব্দও যেন শুনলো অতীন।

আলো জ্বালালো অতীন। তারপর দৃঢ় পায়ে গিয়ে জানালাগুলো খুলে দিলো। দেড়মাসের পর।

এরপর অতীন নিজের মতন পূজাপাঠ শুরু করে দিলো, যা সে গত দেড়মাস ধরে করে এসেছে। পূজা শেষে দাঁড়িয়ে উঠে হুঙ্কার দেয় অতীন, "ডামরী, ভোগ কই?"

অন্যদিনের মতন কিন্তু ডামরী আর গলবস্ত্র হয়ে ভোগ নিয়ে আসে না, দরজার কাছেই থালা রেখে যায়, পাশের রান্নাঘরের দরজা থেকে মৃদু স্বর ভেসে আসে "ভোগটা নিয়ে নাও দাদাবাবু,শরীরটা ভালো নেই আজ।"

ভোগের থালা তুলে নিয়ে এসে মায়ের সামনে রেখে প্রণাম করে অতীন। তারপর নিজের হাতে স্টাডিরুমের তালাচাবি বন্ধ করে। ডামরীকে জানিয়ে দেয় যে আজ তার খিদে নেই, কোথাও রুটি তরকা জিলিপি খেয়ে এসেছে। তারপর নিজের ঘরে শুতে যায় অতীন।

বড় গাঢ় ঘুম হয় অতীনের সেদিন। প্রশান্ত, নিশ্চিত, নির্ভার ঘুম।

হায় অতীন যদি জানতো, কত সহস্র ছায়ামূর্তি তার ঘরের আশেপাশে নিষ্ফল আক্রোশে, রক্তক্রোধে ঘন হয়ে ঘুরছে আর মাথা কুটে মরছে!

সারারাত অতীনের বুক থেকে জ্বলা এক নীলাভ আলো সারা ঘর অধিকার করে রইলো!

****

দ্বিজোত্তম খানিকক্ষণের জন্যে দম নিয়ে নেন, তারপর শুরু করেন,

"দেবী মাতঙ্গীকে বলা হয় দেবী সরস্বতীর তান্ত্রিকরূপ। নিগূঢ় অতিপ্রাকৃত শক্তিলাভের জন্যে তান্ত্রিকরা এঁর সাধনা করেন। শত্রুনাশ, বশীকরণ ও গূঢ়বিদ্যা আহরণ করার জন্যে এঁর পূজাই প্রশস্ত। দেবী প্রসন্ন হলে মহাবিদ্যা দান করেন, সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু এঁর পূজাপদ্ধতি অতি কঠোর। সিদ্ধ সাধক ছাড়া এঁর পূজা সম্ভব না। সামান্য বিচ্যুতিতে দেবীক্রোধাবিষ্ট হন, সঙ্কল্পকারীর মহাসর্বনাশ উপস্থিত হয়।

"বলা হয় ইনি চণ্ডালরাজ মাতঙ্গের কন্যা। দেবী তাই চণ্ডালিনীরূপে পূজিতা হন। দেবী বন জঙ্গল পশু পাখি ইত্যাদির রক্ষাকর্ত্রী, এবং যৌবনমদমত্তা, মত্ত মাতঙ্গী যেমন হয়!

"দেবী মাতঙ্গীর উল্লেখ আছে বৌদ্ধতন্ত্রেও, এবং একই রূপে। তাই বোধহয় সহস্রাক্ষ এই দেবীকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর অভীষ্টসিদ্ধির জন্যে। আপনারা যে মূর্তিটি নিয়ে গেছেন, ওটি দেবীর রাজ-

মাতঙ্গী রূপ। খেয়াল করে দেখবেন, দেবীর পায়ের কাছে খুব ক্ষুদ্র দুটি শুকপাখি আছে, যাদের আমরা বলি টিয়াপাখি!

"দেবী মাতঙ্গীর পূজার একটি বিশেষ বিধি আছে যা বাকি সমস্ত দেবদেবীদের থেকে আলাদা। ইনি যা কিছু অশিষ্ট, অপবিত্র, নোংরা, ফেলে দেওয়া হয় তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্টই এঁর খাদ্য, রজঃস্বলা নারীর রক্তরঞ্জিত লাল কাপড় এঁর পরিধেয়।"

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলেন ভবেশ, "কেন ঠাকুরমশাই, আমরা তো পরিশুদ্ধ না হলে ঈশ্বর আরাধনার কথা চিন্তাও করতে পারি না। এঁর আরাধনার এই রীতি কেন?"

মৃদু হাসেন সেই তন্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ, বলেন "তন্ত্রে অশুচিরও স্থান আছে, এইটে বোঝাতে। মহামায়ার আনন্দযজ্ঞে সবারই অধিকার। যা কিছু বন্য, যা কিছু প্রাকৃতিক, শোভন, অশোভন, শুচি, অশুচি সবই সেই জগদ্ধাত্রীর অংশ, তা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে। দেবী উচ্ছিষ্ট খাদ্যই ভোগ হিসেবে নেন, তাই দেবী মাতঙ্গীর আরেক নাম উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী।

"আর সেই জন্যেই এঁকে ভোগ দেওয়ার একটি বিশেষ বিধি আছে। ইনি বাকিদের মতন সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়া ভোগ গ্রহণ করেন না। যেমন বলেছি, ইনি শুধুমাত্র উচ্ছিষ্ট আহার স্বীকার করেন। অন্যথায় দেবী ভোগ নেন না, এবং ক্ষুধার্ত দেবীর ক্রোধ কালান্তক হয়ে নেমে আসে যজমানের ওপর। পূজারীও তার কোপ এড়াতে পারেন না।"

কাঠ হয়ে যায় ভবেশবাবুর সমস্ত দেহ, সুবেশও সতর্ক হয়ে ওঠে।

"আর যদি পূজারী আর যজমান এক হন?"

"তিনি কি তন্ত্রবিদ?"

" না, এমন কি পূজাপদ্ধতিও জানেন না। নিজের খেয়ালে ফুল বেলপাতা ধূপ ধুনো এইসব দিয়ে পূজা করেন। কোনও বিধিও নেই, কোনও মন্ত্রও নেই। "

অবিশ্বাস ভরা স্তম্ভিত চোখে চেয়ে থাকেন সেই বৃদ্ধ, তারপর বলেন, "পূজাবিধি, মন্ত্র, নিবেদন, এসব ছাড়া দেবী মাতঙ্গীকে ভোগ? তাও আবার উচ্ছিষ্ট নয় এমন ভোগ? কে সেই বদ্ধ উন্মাদ? আপনার সেই বন্ধুপুত্র না কি ? হা ভগবান, আটকান, সে উন্মাদকে এক্ষুণি আটকান। দেবীর ক্রোধ বড় সাংঘাতিক, আমাদের কল্পনার বাইরে। মৃত্যু, সাক্ষাৎ মৃত্যুর পরোয়ানা বেছে নিয়েছে সে। হায় ঈশ্বর, এ আমি কি করলাম? কেন সেই মূর্তির অন্য ব্যবস্থা করলাম না..." সন্ধ্যের অন্ধকারের মধ্যে হাহাকার করে আর্তস্বরে বিলাপ করতে থাকেন সেই বৃদ্ধ।

মুহূর্তে সমস্ত পরিবেশ আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায় যেন শিউরে ওঠে। ভবেশবাবুর হাত পা কাঁপতে থাকে। সেই শিউড়ে ওঠা অন্ধকারে খানিকক্ষণের নৈঃশব্দ।

তারপর এই প্রথম মুখ খোলে সুবেশ, ইতস্ততভাবে জিজ্ঞেস করে, "ইয়ে, ঠিক কি ভাবে বিপদ আসবে একটু বলতে পারবেন কি? তাহলে কিছু যদি আটকানোর ব্যবস্থা করা যেত..."

বিলাপ বন্ধ করেন বৃদ্ধ, তারপর তাঁর ফিসফিসানি শোনা যায়, যেন এই অন্ধকারের ওপার থেকে ভেসে আসছে কথাগুলো,

"দেবী সরস্বতীর তান্ত্রিক রূপ ইনি। ইনি বাক ও বুদ্ধির দেবী। আগে হতভাগ্যের বুদ্ধিনাশ করেন। তার বোধ, চিন্তাশক্তি হরণ করতে থাকেন। তার বেঁচে থাকার ইচ্ছে শোষণ করতে থাকেন। তাকে নোংরা অপরিচ্ছন্ন পোশাক পরতে, নোংরা জায়গায় যেতে বাধ্য করেন। তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা সবই কমে যেতে থাকে। জীবনীশক্তি ক্ষয় হয়, বিপুল স্বাস্থ্যহানি ঘটে। তার সম্মান ও প্রতিপত্তি নষ্ট হয়। আত্মীয় পরিজনদের মহা দুঃখের কারণ উপস্থিত হয়।

"আর তাতেও যদি সে হতভাগ্য পূজা ত্যাগ না করে, তখনই শুরু সর্বনাশের। দশমহাবিদ্যার অধীন কোনও এক পিশাচী হতভাগ্যের পিছু নেয়। মহাক্রোধী সে, মহাকালীর সহচরী, সাক্ষাৎ মৃত্যু। স্বয়ং যমও তাকে ভয় পান। তার কালান্তক লোলজিহ্বা যেন মহামারীর সমান। সে এক এক ক'রে তার পরিবার পরিজনের প্রাণহরণ করে। তারপর বীভৎস তাড়নার পরহতভাগ্যকে হত্যা করে।"

একটু ইতস্তত করেন ভবেশ, তারপর বলেন, "সেই পিশাচীকে চেনার উপায়?"

অন্ধকারের মধ্যেও মৃদু হাসিটা চোখ এড়ায় না কারোরই, "সে আসে মানুষের বেশে, একমাত্র সিদ্ধ যোগী ছাড়া তাকে কেউ চিনতে পারে না। তাকে পশুজগৎ এড়িয়ে চলে, তার ছায়া পড়ে না মাটিতে। যেখানে সে অধিষ্ঠান করে, অলৌকিক সব ঘটনা ঘটতে থাকে, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না। সে মূর্তিমান অমঙ্গল, সাক্ষাৎ মৃত্যু। দেবীর ইঙ্গিতে সে তছনছ করে দিয়ে যায় হতভাগ্যের পরিবার, বুদ্ধি, সম্মান, সম্পত্তি ও প্রাণ।"

সুবেশ দেখতে পায় এই শীতেও ভবেশবাবুর কপালে বিন্দুবিন্দু ঘামের ফোঁটা। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মোছেন প্রৌঢ় অধ্যাপক, "এর কোনও প্রতিকার?"

হেসে ফেলেন দ্বিজোত্তম, "ভগবানের মার, দুনিয়ার বার। অন্তত আমার জানা কোনও প্রতিকার নেই। এক যদি না অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোনও অসাধারণ নারী বা পুরুষ কেউ অহৈতুকী কৃপা করেন। সেরকম মানুষ আজকাল আর দেখা যায় না।"

উঠে দাঁড়ান তিনজনেই, মন্দিরের চাতাল থেকে নামেন। জুতো পরে চলে যাবেন, আবার ঘুরে দাঁড়ান ভবেশ, "কতদিন সময় নেয় এই পিশাচী কাজ শেষ করতে?" "কাজ শেষ" বলার সময় গলাটা একটু কেঁপেই যায় ভবেশবাবুর।

"এক মাস", বলেন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, "এক চান্দ্রমাস। এক অমাবস্যাতিথিতে সে হতভাগ্যের পিছু নেয়, পরের অমাবস্যার আগেই সব শেষ।"

মনে করার চেষ্টা করেন ভবেশ, ডামরী যেন কবে এসেছিল অতীনের সঙ্গে, মাই গুডনেস....ওঁর গলাটা এবার থরথর করে কাঁপতে থাকে, "মানে সে যদি গত মাসের অমাবস্যায় আমার বন্ধুপুত্রের পিছু নেয়, তাহলে আপনার কথামতো..."

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে একটিমাত্র আঙুল তোলেন তন্ত্রবিদ দ্বিজোত্তম মিশ্র, "কালই অমাবস্যা। একদিন, আপনার বন্ধুপুত্রের আয়ু আর মাত্র একদিন।"

****

পরের দিন খুব সকাল সকাল ঘুম ভেঙে যায় অতীনের। উঠেই অনুভব করে যে শরীরটা খুব ঝরঝরে লাগছে। লেপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সে, জানালাটা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কিছু দুরন্ত কুয়াশা আর একঝাঁক সজীব শীত ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে। বল্লমের মতন কিছু দীর্ঘ সূর্যরশ্মি ঘরের এদিক ওদিক গেঁথে যায়।

আশ্চর্য অলৌকিক ভোর।

চটপট ফ্রেশ হয়ে নেয় অতীন। তারপর এক কাপ চায়ের জন্যে বেরিয়ে ডামরীর উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ে সে। একবার নয়, বেশ কয়েকবার।

কিন্তু কোনও উত্তর নেই।

চিন্তায় পড়ে যায় অতীন। আবার এর কি হলো? ওপরে গিয়ে দেখে আসতে হচ্ছে তো!!

দোতলায় গিয়ে অতীনের মনে পড়ে প্রায় দীর্ঘ দু মাস পর দোতলায় পা দিলো সে। অবশ্য দোতলায় বিশেষ কিছু নেইও।

দোতলার পাশ দিয়ে সিঁড়ি, সিঁড়ি বেয়ে উঠে ছাদ, আর তার পাশেই চিলেকোঠা। ডামরীর যেখানে থাকার কথা।

ছাদে পা দিয়েই গা গুলিয়ে উঠলো অতীনের। সারা ছাদ জুড়ে বিভিন্ন পশু ও পাখির হাড়, কাকের ভাঙা বাসা, বড় বড় পালক, কাকের কাটা মাথা, এমন কি শকুন বা ওই জাতীয় কোনও পাখির দুটো কাটা পা অবধি পড়ে আছে! দুয়েকটা ভাঙা কুলো আর ঝাঁটা এক কোণে, তার পাশে সিঁদুরের স্তুপ আর বড় নারকেল মালায় রাখা খানিকটা কিসের তেল যেন! পাশে কিছু কালো সর্ষে ছড়ানো।

আতঙ্কিত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছিল এসব অতীন। এসব কী তার বাড়ির ছাদে? কারা করেছে? মানে কি এসবের? ডামরী দেখেনি এসব?

হঠাৎ তার ষষ্ঠ ঈন্দ্রিয় তাকে জানান দিলো যে তার এখানে থাকা ঠিক নয়। তাকে নিচে যেতে হবে। এক্ষুণি নিচে যেতে হবে। একমুহূর্তও সে যেন এখানে দাঁড়িয়ে না থাকে। তার ঘাড়ের সমস্ত রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেলো, হঠাৎ করে দুরন্ত শীতে তার দাঁতকপাটি লাগার উপক্রম।

কাঁপতে কাঁপতে সে নিচে নেমে এলো। বাথরুমে ঢুকে গিজারের গরম জলে স্নান করার পর তার হাতে পায়ে কিছু সাড় আসে।

স্নান করে সে ঝটপট জামা কাপড় পরে নেয়। তারপর ঘর থেকে বেরিয়েই দেখে ডাইনিং টেবিলের পাশে ডামরী।

তার দিকেই স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

সাতসকালেই ডামরীকে দেখে বিভ্রান্ত হয়ে যায় সে। এ কি সেই নিঃসহায় নিঃসম্বল গ্রাম্য মহিলা, যাকে সে প্রায় রাস্তা থেকে তুলে এনে ঘরে জায়গা দিয়েছে? ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে?

মুখটা একটু লম্বাটে দেখাচ্ছে ডামরীর, গালগুলো ভাঙা ও শুকনো। একরাত্রেই যেন গায়ের রঙ কয়েক পোঁচ গাঢ় কালো হয়ে এসেছে। হাতের শিরা অস্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আছে, নখগুলোও দীর্ঘ, কালো ও বাঁকানো। শুকনো চুলগুলো হাহাকারের মতন উড়ছে হাওয়ায়।

শীতল কন্ঠে প্রশ্ন করলো ডামরী, "তুমি ছাদে গেছিলে?"

গলা শুনেই চমকে উঠলো অতীন। সেই গ্রাম্য বিধবার করুণ গলার স্বর কই? এই কর্কশ, তীক্ষ্ণ ও সামান্য সানুনাসিক গলা কার? আর শ্বদন্তদুটি অত বড় হলো কি করে?

ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি ধরছিল অতীনের। ঠিক এই সময়েই সে টের পায় তার বুকের মধ্যে ধীরেধীরে উষ্ণতা ছড়িয়ে দিচ্ছে সেই স্ফটিকখণ্ড। আর কোথা থেকে তার সেই শিরশিরানিভাবটা উধাও হয়ে গিয়ে স্বাভাবিক সাহসটা ফিরে আসছে। সে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে, "ছাদে অত নোংরা কেন? তুমি থাকো ছাদে, এগুলো দেখতে পাও না? কিসের জন্যে রাখা হয়েছে তোমাকে?"

এরপরের ঘটনাটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না অতীন। ধ্বক করে জ্বলে ওঠে ডামরীর চোখ দুটো, যেন চোখের কোটরে দু'টুকরো কাঠকয়লা জ্বলছে। ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখা হাতটা প্রবল আক্রোশে মুঠো করতে চায় সে, নখের আঘাতে কাঠের গা থেকে একটা ক্যরররররর আওয়াজ উঠে আসে অশ্লীল বীভৎসতার মতন।

আর সেই ঠিক সেই মুহূর্তেই, অতীন বুঝতে পারে আরও জ্বলে উঠেছে তার বুকের সেই স্ফটিক। না তাকিয়েও বুঝতে পারছে বুকটা পুরো নীল আভায় ভরে গেছে।

দুইজনেই দুইজনের সামনে প্রতিস্পর্ধীর ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর যা ঘটলো সেটা ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়। যেন কিছুই হয়নি, এমন ভঙ্গিতে আগের মতই লাজুক স্বরে ডামরী বললো, "শরীলটা ঠিক নেই গো দাদাবাবু, পাখিতে এনে কিছুমিছু ফেলেছে বোধহয়, আমি আজই পোষ্কার করে দিচ্ছি।"

ডামরী ফের সেই গ্রাম্য বালাটি। গোলগাল স্নেহময় মুখ, স্বাভাবিক চোখ ও নখ। লাবণ্যময় হাত দুখানি। যেন এক মুহূর্ত আগের সেই পৈশাচিক রুদ্রমূর্তির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্কই নেই!

তারপর মাথা নামিয়ে খুবই দুঃখের সঙ্গে বলে, "তবে একটা খারাপ খবর আছে দাদাবাবু, সকালে উঠে চাবি দিয়ে তালা খুলে দেখি মা আজ ভোগ নেননি। আমার রান্নায় নিশ্চয়ই কিছু খুঁত ছিলো, নইলে মা নেবেন না কেন? আজ তুমি একটু রাত করে ফিরো, কেমন? আজ অমাবস্যা, আজ মায়ের জন্যে মহাভোগ রান্না করে দেবো। ঠিক আছে? মাকে আজ খুশি না করে ছাড়বই না", বলে খিলখিল করে হেসে ওঠে ডামরী।

খিলখিলের মধ্যে একটা শিউড়ে ওঠার মতন খলখল হাসির শব্দও কি মিশে ছিল? মেট্রোতে যেতে যেতে সে কথাই ভাবে অতীন।

অফিসে সবাই অতীনের এই আপাত পরিবর্তনে স্পষ্টতই খুশি হয়। বহুদিন বাদে সহকর্মীরা চুটিয়ে গল্প করে। রিজিওনাল ম্যানেজার সাহেব এসে একসঙ্গে সিগারেট খান, কুশল জিজ্ঞেস করেন, এবং যথারীতি একগাদা কাজ চাপিয়ে দেন!

অফিস থেকে বেরোতে বেশ রাত হয়ে যায় অতীনের। নতুন প্রডাক্ট লঞ্চ হবে। তার প্ল্যান প্রোগ্রাম বানিয়ে, রিজিওনাল ম্যানেজারকে দিয়ে অ্যাপ্রুভ করিয়ে, সেলস ম্যানেজারদের পাঠিয়ে অফিসের ঝাঁপ বন্ধ করতে করতে প্রায় সাড়ে ন'টা।

পাড়ায় ঢুকতে ঢুকতে প্রায় সাড়ে দশটা কি এগারোটা হয়ে যায় অতীনের। আর ঠিক সেই সঙ্গে লোডশেডিং। দাঁড়িয়ে পড়ে অতীন।

যাঃ, একে অমাবস্যার রাত, তার ওপর লোডশেডিং। রাস্তার ত্রিফলাগুলো অবধি জ্বলছে না। মোবাইলেরও ব্যাটারি তলানিতে, ফ্ল্যাশলাইট জ্বালাবার প্রশ্নই নেই। হাতড়ে হাতড়ে কোনওরকমে এগোচ্ছিল অতীন। অদ্ভুতভাবে তাদের পাড়াটাও আজ নিশ্চুপ। এমনিতেও নেতাজিনগর বাঙালদের এলাকা। লোকে নিজেদের মধ্যে প্রেমের কথাও সারা পাড়া না জানিয়ে বলতে পারে না। সেই এলাকা এমন নিঃশব্দ, এ তো ভাবাই যায় না! এই সময় তো লাইট জ্বালিয়ে ব্যাডমিন্টন, আড্ডা ইত্যাদি চলার কথা। লোডশেডিং বলে এরকম বিলকুল শুনশান হয়ে যেতে হয় না কি? এ কি গ্রামগঞ্জ, আটটা বাজলেই রাস্তাঘাট ফাঁকা?

অনেক কষ্টে, পা প্রায় ঘষে ঘষে এগোচ্ছিলো অতীন। হঠাৎ করে কে যেন তার কাঁধ খামচে ধরে। সে চমকে ওঠে প্রথমে, তারপর সেই আগন্তুকের গলায় "অতীন" ডাক শুনে নিশ্চিন্ত হয়, "কাকু, আপনি এখানে? এত রাতে? সারা পাড়া এত শুনশান কেন? সবাই কোথাও গেছে না কি? কোত্থাও একটা টর্চ, হ্যারিকেন, মোমবাতি কিছুই জ্বলছে না দেখছি।"

"জ্বলবেও না অতীন। আজ কোথাও কোনও আলো জ্বলবে না। কেউ জেগে থাকবে না। আকাশের দিকে তাকাও অতীন, কালরাত্রি নেমেছে, দেখতে পাচ্ছো?"

অতীনের সব কিছু গুলিয়ে যায়। কালরাত্রিটা কি বস্তু? আর এসব কি বলছেন ভবেশকাকু?

"আমি পাড়ার বাইরে ছিলাম এতক্ষণ। তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। আজ সারা পাড়া মড়ার মতন নিঃসাড়ে ঘুমোবে অতীন। আকাশের দিকে তাকাও অতীন। এ বড় ভয়ানক রাত। মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এসেছে অতীন, তোমার জন্যে। আজ আমি সারারাত তোমার সঙ্গে থাকবো, তোমার বাড়িতেই।"

আকাশের দিকে তাকায় অতীন, আর তখনই ব্যাপারটা তার বোধগম্যতার মধ্যে আসে।

সমস্ত চরাচর কেমন যেন এক বিস্তীর্ণ নিঝুম স্তব্ধতায় কুঁকড়ে আছে। শুধু যে আলো নেই তা নয়, শব্দও নেই। ধুলোয় মলিন কলকাতার আকাশ। তারাগুলো যেন লাল রক্তবিন্দুর মতন জ্বলছে।

কোথাও কোনও প্রাণ নেই, রূপ নেই, রঙ নেই, গন্ধ নেই। ঘোর অমানিশা যেন কোন এক বিপর্যয়ের আশঙ্কায় মূক।

এই মোড় থেকে শেষ বাড়িটা অতীনের, এখান থেকেই স্পষ্ট দেখা যায়। অতীন দেখলো তার বাড়ির ওপরে খুব ধীরেধীরে একটা মিহি অন্ধকারের চাদর যেন নেমে আসছে। যেন একটা সর্বগ্রাসী অমঙ্গল সূক্ষ্ম পাপের মতন জড়িয়ে ধরছে বাড়ির সর্বাঙ্গ।

"দাঁড়াও অতীন, তোমাকে কয়েকটা কথা এক্ষুণি বলা দরকার।"

আরও প্রায় আধঘণ্টা। ভবেশবাবু তাঁর ও সুবেশের বামুনগাছি যাওয়া ও দ্বিজোত্তম মিশ্রের সঙ্গে কথোপকথনের পুরোটাই বলেছেন অতীনকে। গাঢ় নিকষ কালোর সঙ্গে মিশে গেছিলো ভবেশবাবুর ফিসফিসানি।

চুপ করে থেকেছে অতীন, শুধু একটাই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে, "আজ রাতটা পাড়ার বাইরে কাটালে হয় না?"

"আজ রাত্রে এ পাড়ায় যে ঢুকবে, তার আর বেরোবার পথ নেই অতীন। আর যেখানেই যাও, সেই পিশাচী তোমাকে ছাড়বে না। আজই তার কর্মসমাপ্তির দিন, সমস্ত হিসেব চুকিয়ে দেওয়ার দিন। তার শিকার আজ সে ছাড়বে না অতীন।"

"কিন্তু কাকু, আপনি কেন স্বেচ্ছায় এর মধ্যে..."

অন্ধকারের মধ্যেও ক্ষীণ হাসিটা বুঝতে অসুবিধা হয় না অতীনের, "তুমি হয়তো বুঝবে না বাবা। সবাইকে একদিন তাঁর কাছে গিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়াতে হয়। কৃতকর্মের কৈফিয়ত দিতে হয়। তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন বিপদের দিনে পিতৃহীন মাতৃহীন ছেলেটাকে একলা ফেলে কোথায় পালিয়ে গেছিলে, কি জবাব দেবো অতীন?" নিঃশব্দে হাসতে থাকেন সেই প্রৌঢ়।

কালই কে একজন যেন বলছিলেন না অতীনকে, যে ভালোবাসা হলো সবচেয়ে বড় তন্ত্র, সবচেয়ে বড় যাদু?

নিজের বাড়ির তালা খুলে নিঃশব্দে প্রবেশ করে অতীন, পিছন পিছন ভবেশবাবু। এবং ঢুকেই দুজনে হিম আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যান। একটা তীব্র মড়াপচা গন্ধ হু হু করে ছুটে আসে দুজনের দিকে, দুজনেই দ্রুত নাকে রুমাল চাপা দেন।

এবং ঠিক তক্ষুনি সদর দরজাটা নিজে থেকেই নিঃশব্দে আঁট হয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর বাঁ দিকে যেতে চান দুজনেই, ওদিকেই রান্নাঘর।

এই জায়গায় একটা চেয়ার থাকার কথা, কারণ তার পাশেই ডাইনিং টেবিল। অভ্যেসমতন হাতটা বাড়ায় অতীন, এবং সে হাত শূন্যে ফিরে আসে।

পা ঘষে ঘষে আরেকটু এগোয় দুজনে। আশ্চর্য পিনপতনস্তব্ধ নৈঃশব্দ সারা বাড়ি জুড়ে। কয়েক পা এগোতেই অতীন বুঝতে পারে যে পুরো জায়গাটাই ফাঁকা।

এইবার একটা মৃদু টুপ শব্দ দুজনেরই কানে আসে, কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি দিয়ে, আরেকবার, টুপ। কিন্তু কিসের শব্দ বোঝার উপায় নেই।

এর পর রান্নাঘরে হঠাৎ করে একটা লালচে আলো জ্বলে ওঠে। রান্না করবার আলো কি ? সেই আলোর অতি সামান্য অংশ এসে পড়ে এদিকে। তাতে দুজনেই দেখে যে সমস্ত মেঝে ফাঁকা, কিচ্ছু নেই।

অতীন আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল জিনিসগুলো গেলো কই, এমন সময় পাঁজরে একটা মৃদু গোঁত্তা খেয়ে ভবেশবাবুর দিকে তাকায় অতীন, দেখে ভদ্রলোক আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে অতীনও সিলিঙের দিকে তাকায়, এবং আতঙ্কে কাঠ হয়ে যায়।

ডাইনিং টেবিল, চেয়ার, শ্যু র‍্যাক, কফি টেবিল, পাপোষ প্রত্যেকটা জিনিষ উল্টো হয়ে সিলিঙের সঙ্গে লেগে ঝুলছে। এবং প্রতিটা বস্তু থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে কোনও এক তরল মেঝেতে এসে ছিটকে পড়ছে, থেকে থেকে হাড় হিম করা শব্দ উঠছে, টুপ!

সেই আবঝা আলোতেও বোঝা যায় যে সেই তরলটি রক্ত, এবং তার রঙ লাল, ঘন লাল।

এই বার থরথর পায়ে দুজনে রান্নাঘরের দিকে এগোন, দু পা দূর এগোতেই একটা খোনা গলায় মন্ত্রোচ্চারণ করার সুর ভেসে আসে।

ধীরেধীরে দুজনেই উঁকি দেন রান্নাঘরের ভেতরে, এবং আধো খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে উঁকি দিয়ে বিদ্যুতস্পৃষ্টবৎ স্থানু হয়ে যান।

ডামরী রান্না করছে! এবং তাকে দেখে দুজনেরই হৃদপিণ্ড মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায়। অতীন তাকে দেখে আতঙ্কে অসাড় হয়ে পড়ে।

কে এই সম্পূর্ণ উলঙ্গ পিশাচী? শুকনো অস্থিসার দেহ, সাপের মতন উড়ছে তার খোলা চুলগুলো। বীভৎস মুখ তার, অক্ষিকোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে বড় বড় রক্তবর্ণ চোখ, কালোঠোঁটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আছে তাজা রক্তস্নাত, ঈষৎ বড় দুটি শ্বদন্ত। গলায় বিভিন্ন পাখির কাটা পা নিয়ে গাঁথা এক বীভৎস মালা ঝোলানো।

ঘরের ঠিক মাঝবরাবর শূন্যে ভেসে আছে সেই পিশাচী। তার কপালে আর সমগ্র অঙ্গে তেল আর লাল সিঁদুর বিশেষ মুদ্রাছাপে অঙ্কিত। তার পা দুটি সামনে প্রসারিত, এবং সে দুটি দাউদাউ করে জ্বলছে। সেই জ্বলন্ত পা দুটির ওপর রাখা একটি হাঁড়ি, তার ভেতর থেকে লালচে ধোঁয়া উঠছে।

সেই ডাকিনী প্রথমে তার শিরা ওঠা বাম হাত দিয়ে নিজের একটি স্তন নিজের বুক থেকে ছিঁড়ে নেয়। তারপর রক্তঝরা দাঁতদুটি দিয়ে তার স্তনবৃন্তটি ছেঁড়ে, উপচে পড়ে গাঢ় কালচে রক্ত। সেই রক্ত ডানহাতে ধারণ করে সে ফেলে সেই হাঁড়ির মধ্যে। তারপর ছিন্ন স্তনটি হাঁড়ির ওপর ধরে মোচড়াতে

থাকে যতক্ষণ না রক্তের শেষ বিন্দুটুকু অবধি পাত্রের মধ্যে পড়ে। অতঃপর সে বিচ্ছিন্ন স্তনটি ফের বুকে লাগিয়ে নেয়, যেন কিছুই হয় নি!

এরপর সে বামহাতটি দীর্ঘ করে সে ঘরের কোণ থেকে একটি কাটা হাত তুলে আনে। তারপর শক্ত এবং কালচে হয়ে যাওয়া হিংস্র নখ দিয়ে সেই কাটা হাত থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে সেই হাঁড়ির মধ্যে দেয়। একটু করে দেয়, আর তারপর ডান হাত সেই হাঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নাড়তে থাকে, এর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে অশরীরী খোনা গলায় সুরেলা মন্ত্রোচ্চারণ।

ভবেশবাবু দরজা ধরে কাঁপতে থাকেন। অতীনের মনে হয় সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। চৈতন্য বিলুপ্ত হতে হতে শেষ বারের মতন তার দৃষ্টি সেই কাটা হাতটির ওপর পড়ে।

হাতের অনামিকাতে একটা আংটি না?

এই আংটিটাই অতীনের মা মারা যাবার আগে সবাইকে সাক্ষী রেখে পুষ্পদিকে দিয়ে যাননি?

এই আংটি অতীনের চেনা।

এই হাতও অতীনের চেনা।

এ হাত পুষ্পদির হাত!!

মা বাবা মরে যাবার পর যে মানুষটা অতীনকে নিজের ছেলের মতন আগলে রেখেছিল, তার হাত!

সেই বোধবুদ্ধি ভোঁতা করে দেওয়া অলৌকিক ভয়বিহ্বলতার মধ্যেও এই কথাটা অতীনের বুকে গেঁথে গেলো, এই পিশাচীই খুন করেছে পুষ্পদি'কে!!

কোথা থেকে একটা অব্যক্ত ক্রোধ অতীনের চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। রাগে তার সারা গা রি রি করে জ্বলতে থাকে। সে দরজার সামনে এসে সজোরে লাথি মারে দরজায়, দু হাট হয়ে খুলে যায় দরজা। থুতু ছিটিয়ে অতীন খিস্তি করে "শয়তান ডাইনি, পুষ্পদিকে তুইই খেয়েছিস না? আমি আজই তোকে খুন করবো রাক্ষুসী, নিজেকে কি ভেবেছিস তুই?"

ধীরেধীরে সেই পিশাচীর ঘাড় ঘোরে এদিকে, শরীর ঘোরে না, শুধু ঘাড় ঘোরে। তারপর সেই প্রেতিনী খলখল শব্দে হেসে ওঠে, দুইহাতে তালি দেয়, হাসতে হাসতে খোনা গলায় বলে, "মাকে ভোগ দেবে না দাদাবাবু? মহাভোগ?"

তারপর সমস্ত রান্নাঘর, সমস্ত পাড়া, সমস্ত জগত, অতীনের সমস্ত চৈতন্য জুড়ে ঝড় ওঠে, কালরাত্রির মহাঝড়। অতীন দেখে সে যেন শূন্যে উত্থিত। তার চোখের সামনে আকাশের নীল চাদর যেন একঝটকায় কে ছিঁড়ে নিলো। তখন অতীনের সামনে মহাশূন্য, আর সেই মহাশূন্যের সামনে সে একা, চারিধারে সর্বগ্রাসী, সর্বনাশী, সর্বধ্বংসী কালক্ষুধা। তার চারিপাশে শ্মশানের আগুন আকাশ বাতাস জ্বালিয়ে গলিয়ে সেই গলানো লাল টকটকে পাপ যেন তরল মোমের মতন তার চৈতন্যের ওপর ফেলছে। কোন রসাতল থেকে যেন উঠে এসেছে হিংস্র শিয়ালেরা আর বীভৎস দর্শন দুই কুকুর, তাদের হিংস্র শ্বদন্ত আর রক্তলোলজিহ্বা থেকে রক্তফেনা উড়ে উড়ে পড়ছে। গলিত শব আর

কঙ্কালের দল খলখল করে হাসতে হাসতে তাকে ঘিরে তালি দিয়ে নাচছে। অতীনের দিকে উড়ে আসে সিঁদুরমাখা হাড়ের টুকরো, কালচে রক্তের ছিটে। পচা চর্বি আর রক্ত পোড়া অভিশপ্ত পূতিগন্ধে তার চেতনা বিলীয়মান। তবুও শরীরের সমস্ত শক্তি সংহত করে সে দেখে সেই পিশাচী সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে সিলিং বেয়ে বেয়ে ধীর এবং নিশ্চিত পদক্ষেপে তার দিকে আসছে, উলটো হয়ে ঝুলছে তার অভিশাপের মতন উড়ন্ত চুল। খোনা গলায় সে জিজ্ঞেস করছে, "মায়ের মহাভোগ দেবে না দাদাবাবু? খিঃ খিঃ খিঃ..."

অতীনের একদম কাছাকাছি এসে গেছে সে, মড়াপচা অভিশপ্ত গন্ধে অতীনের চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায়, সেই পিশাচিনী দীর্ঘ হাত বাড়িয়েছে অতীনের গলা লক্ষ্য করে...

দুম করে যেন একটা আলোর বিস্ফোরণ ঘটে গেলো ঘরের মধ্যে। দপদপ করে অতীনের বুকের কাছে একটা আগ্নেয়গিরি নীল আভা উদগিরণ করতে শুরু করলো পাগলের মতন। তার প্রথম ধাক্কাতেই সব অশরীরী অপ্রাকৃত অশুচি আত্মারা ছিটকে পড়ে চারিদিকে। সেই পিশাচী এক মরণান্তিক আর্তনাদ করে মেঝেতে ধপ করে পড়ে যায়। ধীরেধীরে অপসৃত হতে থাকে যাবতীয় নরকভোগী পূতিগন্ধ।

অতীন বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে তার বুকের স্ফটিক থেকে সঞ্জাত সেই আলো তার শরীরের চারিপাশে এক অলৌকিক বলয় তৈরি করেছে। শুধু সে নয়। মাটিতে লুটিয়ে থাকা অজ্ঞান ভবেশবাবুর শরীরের চারিপাশেও এক আবরণ তৈরি করে রেখেছে।

ভালোবাসা হলো সবচেয়ে বড় তন্ত্র, সবচেয়ে বড় যাদু!

আর সেই নীল বলয় ঘিরে সব অভিশপ্ত, নারকীয়, ভয়াল, পিশাচযোনিসম্ভূত ছায়া অব্যক্ত ক্রোধে নাচতে থাকে, সেই বলয় ছিঁড়ে ঢুকে আসতে চায়। উফফ কি বীভৎস তাদের চাউনি, কি উগ্র তাদের আক্রোশ। অতীনের সমস্ত জাগ্রত চেতনা ওলটপালট হয়ে যেতে থাকে।

কিন্তু কেউই সেই বলয় ভেদ করে আসতে পারে না।

এরপর মেঝে থেকে একটা খড়্‌ড়্‌ড়্‌ড়্‌ড় শব্দ ওঠে। সেই ভূলুণ্ঠিতা পিশাচী নিজের গলার হার থেকে শুকনো পাখির পা ছিঁড়ে নিয়ে নিজের কপালে লেপ্টে থাকা রক্তসিঁদুরে মাখিয়ে নেয়, তারপর বিড়বিড় করতে করতে তা নিক্ষেপ করে অতীনের দিকে।

জবাবে অতীনকে ঘিরে থাকা সেই আলো দপ করে জ্বলে ওঠে। আর কিছুই হয় না।

পিশাচী খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দেখে।

তারপর ঝড় ওঠে। হঠাৎ করে এক কালো ঝড় পিশাচীকে আচ্ছন্ন করে। বাকি সমস্ত ছায়াপ্রেত সেই ঝড়ে মিশে ঘূর্ণির মতন ঘুরতে থাকে। সেই ঘূর্ণন তীব্র হলে পর তা এক দমকে দরজা দিয়ে ছিটকে বেরোয়।

অতীন তার ধাক্কায় মুখ থুবড়ে উলটে পড়ে। কিন্তু আঘাত লাগে না।

সেই কালো ঝড় স্টাডি রুমে ঢোকে।

অতীন বহুকষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে স্টাডিরুমের দরজার কাছে যায়। এবং ভিতরের দৃশ্য দেখে পাথর হয়ে যায়।

সেই উলঙ্গিনী পিশাচী দেবীর দিকে পিছন ফিরে উবু হয়ে বসেছে, সে ঝুঁকে বসেছে দেবী সামনে দেওয়া ভোগের ওপর। সে কি নারকীয় বমনোদ্রেককারী দৃশ্য! ডাকিনী খিলখিল করে হাসতে হাসতে দুই হাতে সেই ভোগ উগ্র বুভুক্ষুর মতন দুই হাতে মুখে পুরছে! দু'হাতে ছড়াচ্ছে, আবার দু'হাত দিয়ে মুখে পুরছে, কিছু ছিটিয়ে ফেলছে থুতুর মতন। কিছু তুলে সারা মাথায় আর মুখে মাখছে।

অতীনের আর সহ্য হলো না। কোনওমতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে সে বুক থেকে বার করে আনে সেই জ্বলন্ত নীল স্ফটিকখণ্ড, তারপর সজোরে ছুঁড়ে মারে সেই উগ্র ডাকিনীর দিকে।

একটা বিস্ফোরণ ও আর্তনাদের শব্দ। তারপর অতীনের চোখের সামনে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে আসে।

অত রাতে কেউ যদি জেগে থাকতো, তবে সে দেখতো যে হঠাৎ পাড়ার শেষ বাড়িটায় দপ করে জ্বলে উঠেছে একটা নীল আলো। সারা বাড়িটা থেকে যেন এক নীল আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অভিশাপের মতন যে কালো ছায়ার পরত সারা বাড়িটা ঘিরে নেমে এসেছিল, আস্তে আস্তে তা উঠে যাচ্ছে, গুঁড়ো হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছু উড়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে। সব শেষে একটা দীর্ঘ কালো ছায়া বেরিয়ে আসে বাড়ি ছেড়ে। এক নারকীয় হাহাকার ও আর্তনাদের সঙ্গে সেও মিশে যায় মহাশূন্যে।

★★★

একসপ্তাহ হাসপাতাল থাকতে হয়েছিল ভবেশবাবুকে। ছাড়া পেয়েই উনি তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের ওপর নতুন উদ্যমে পড়াশোনা শুরু করেন।

অতীন পরের দিন রাতভোরে মূর্তিটা হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসে। এখন তার শখ হয়েছে ফুলের বাগান করার। তার গোলাপের কালেকশন দেখার মতন।

শুধু মাঝরাতে যখন কোনও ছোট মালবাহী জাহাজ হাওড়া ব্রিজের নিচ দিয়ে যায়, কোনও কোনও নাবিক মাঝেমধ্যে জলের অনেক নীচ থেকে এক তীব্র লাল আলো দেখতে পায়, আর শোনে অতল জলের নিচ থেকে উঠে আসা সেই আহ্বান,

"আমাকে উদ্ধার করো, নাবিক। আমার খিদে পেয়েছে। আমাকে উদ্ধার করো। মহাক্ষুধা আমার। আমাকে ভোগ দাও, ভোগ!"